৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

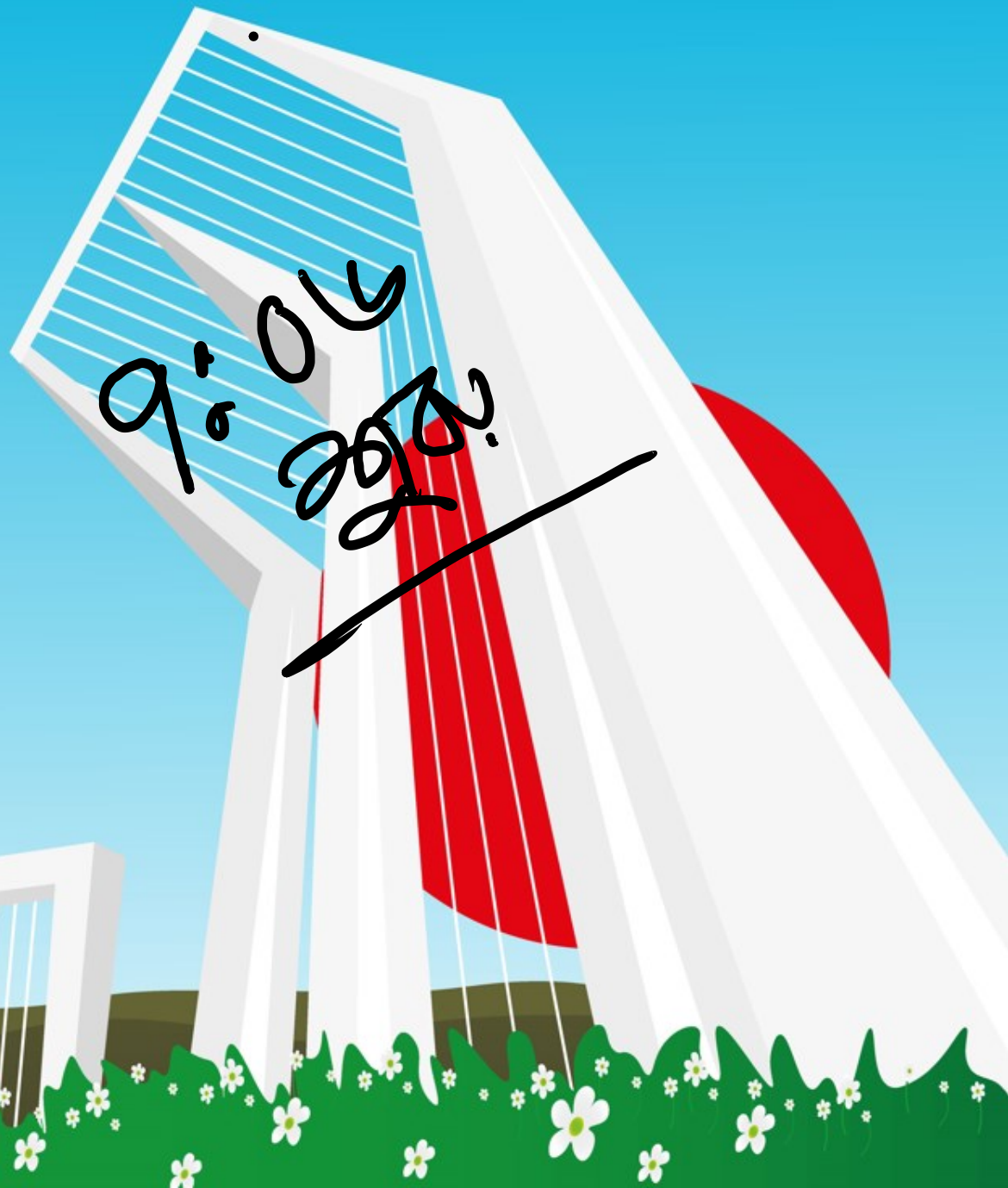

লেকচার: ০৬+০৭

টপিক:

- ✓ **আধুনিক যুগ-১:** যুগসন্ধিক্ষণ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ✓ **আধুনিক যুগ-২:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।
- ✓ **গ্রন্থ-সমালোচনা-১:** (বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা, শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত গ্রন্থ/তাঁকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা, উপন্যাস, গল্প, কবিতাগ্রন্থ)।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১। 'চতুর্দশপদী' কবিতা-র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন । [৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]

২। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিশেষত্ব নিরূপণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]

৩ মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]

৪ বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কতখানি? [৪৪তম বিসিএস]

৫ 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক কে এবং কেন? [৪৪তম বিসিএস]

৬ বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে কী বোঝেন? [৪৩তম বিসিএস]

৭ মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন। [৪১তম বিসিএস]

৮ আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস]

৯ বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? এ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]

১০ 'সনেট' কী? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। [৩৮তম বিসিএস]

১১ 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

১২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

১৩ বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? কেন তাঁকে ভোরের পাখি' বলা হয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]

[illegible]

[illegible]

② [illegible]

২/৩ [illegible]

[illegible]

๑๒๕๑

๑๒๕๑

๑๒๕๑

Suffering

Doing

Q & A

নাব্যতার বদ্বীপ
(চোরাবালি)

- ✓ যশোর, ঝিনা
- ✓ ভোলার মুহূ. চাঁদ
- ✓ কেওড়াতলা মুহূ. চাঁদ
- ✓ নাগর চন্দ্র সংগ্রামজীত ২০০.
- ✓ নাগাব কর্ণাটক [illegible] / মুক্ত [illegible]
- ✓ নাগাব মুক্ত সাগর মাল কাপাং [illegible]
- ✓ মহাজনার মর্ত্য সাগর [illegible]
- ✓ মহামেঘ [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible]:

[illegible] [illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] ([illegible] [illegible])

[illegible]. [illegible]

[illegible] [illegible]. ร.พ. [illegible]

ตำบล, [illegible]. [illegible]

[illegible] [illegible] . [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible].

[illegible]

(จบ)

মনসুর হাসমী

২ বছর বেকার, তবে সৌভাগ্য

৬ মাস

৫ মাস

মাসে ২০

প্রতি দিনে ২৪ ঘণ্টা

৮+৬ = ১৪ ঘণ্টা

ঘুম খাওয়া

গোসল খাওয়া

বাকির দাওয়াত

প্রথম ৫ মা.

শেষ ৫ মা.

যুগসন্ধিক্ষণ

- যুগসন্ধিক্ষণ বলতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ কালপর্বকে বোঝায়। এটি মূলত দুই যুগের সন্ধি বা মিলনের সময় যখন সাহিত্যজগতে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।
- ১৭৬০ সালে মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আধুনিক যুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। এর মাঝে প্রায় ১০০ বছরব্যাপী সাহিত্যজগতে চলেছিল বন্ধ্যাকাল, ফলে এই সময়টুকুকে অবক্ষয় যুগ বা যুগ সন্ধিক্ষণের যুগ বলা হয়।
- ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যযুগ শেষ হওয়ার পরে এবং আধুনিক সাহিত্য তথা জীবনমুখী সাহিত্যধারা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ই বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে এ সময়ে তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায় না। তখন বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভবের কাল এবং সাহিত্যের যথার্থ বাহনের উপযোগিতা বাংলা গদ্যে অর্জিত হয়নি।
- আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন চলে আসে। এ সময় মধ্যযুগের ধর্ম ভিত্তিক সাহিত্যের পাশাপাশি লৌকিক কাহিনিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সাহিত্যিক ঘরানার সূচনা ঘটে।
- এ সময়ের সাহিত্যিক ঘরানাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

  ✓ কবিওয়ালা ও শায়েরদের উদ্ভব ✓ পুঁথি সাহিত্যের বিকাশ ✓ টপ্পা গান ✓ পাঁচালি গান ✓ শাক্ত পদাবলি

[illegible]

আধুনিক যুগ

☐ আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানবিকতা, ব্যক্তিচেতনা, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, মৌলিকতা, মুক্তবুদ্ধি, নাগরিকতা, মুদ্রণযন্ত্র, আঙ্গিকের রূপান্তর ও মানুষের প্রাধান্যভিত্তিক রচনা। এর সাথে যোগ হয়েছে- রোমান্টিকতা, যান্ত্রিকতা, প্রগতিশীল চিন্তা ও নগরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থাপনা। গদ্য সাহিত্যকে এ যুগের প্রতিভূ বলা হয়। এ যুগে গদ্যনির্ভর সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের ফলে সাহিত্যে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সৃষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

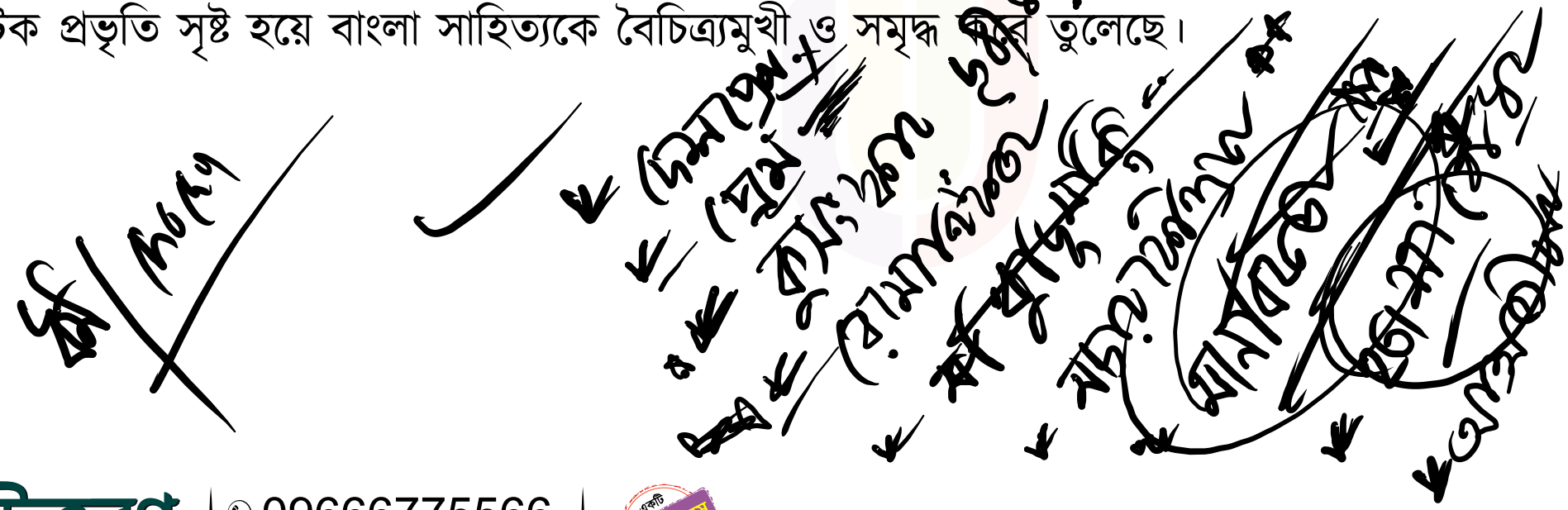

আধুনিক যুগ

❑ গদ্য সাহিত্যের সূচনা

- ১৫৫৫ সালে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়।
- এছাড়া ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত ঢাকার ভূষণার জমিদার পুত্র দোম অ্যান্টনিও রচিত ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (পটভূমি) বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।
- এছাড়া –

বাংলা কথ্য ভাষার আদিগ্রন্থ	মনোএল দা আসসুম্পসাঁওয়ের রোমান লিপিতে লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'
বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ	মিশন সমাচার (মথী রচিত)

- আঠারো শতকে বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশ সূচিত হলেও মূলত সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে। এসময় প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন।

আধুনিক যুগ

ছোটগল্পের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

- ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে বৃহতের ইঙ্গিত থাকবে।
- শুরু ও উপসংহার হবে নাটকীয়।
- বিষয়বস্তু সাধারণত স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে চলবে।
- বাহুল্য বর্জনের মাধ্যমে গল্পটি হয়ে উঠবে রসঘন।
- রূপক বা প্রতীকের মাধ্যমে অব্যক্ত কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত।
- গল্পসমাপ্তির পরেও পাঠকের মনের মধ্যে এর গুঞ্জণ চলতে থাকবে।

নমস্কার :

Rosume : 8 : 35

Welcome

❑ মহাকাব্য

- মহাকাব্য দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা বিশেষ। যে কাব্যে কোনো দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু নৃপতি বা রাজা-বাদশাহর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়, তা মহাকাব্য নামে পরিচিত।
- যিনি মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি মহাকবি নামে পরিচিতি পেয়ে থাকেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হলো মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

❑ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে ৪ মে, ১৮০০ খ্রি. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলি। ইংরেজ অফিসারদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৮০১ খ্রি.। বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং একই সময় রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্যিক প্রভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির সময় কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর অবদান স্মরণীয়। ১৮০১-১৮১৫ সাল পর্যন্ত মোট ৮ জন লেখক ১৩টি বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা করেন। এই ৮ জনের অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরিকে বাংলা শেখান রামরাম বসু। এজন্য তাকে কেরি সাহেবের মুন্সি বলা হয়।

আধুনিক যুগ

লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশকাল	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
উইলিয়াম কেরি	কথোপকথন	১৮০১	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	ইতিহাসমালা	১৮১২		হিতোপদেশ	১৮০৮
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১		রাজাবলি	১৮০৮
	লিপিমালা	১৮০২		প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	১৮০২	তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫	চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
			হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

[illegible]

আধুনিক যুগ

❑ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সংস্থাটির মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। সেখান থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সংগঠনের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। শিখা পত্রিকার স্লোগান– 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম লেখক ছিলেন – কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

❑ হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

কলকাতায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। ১৮২৮ সালে তাকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল হলো ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক। হিন্দু সমাজের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো এঁদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু প্রথা তথা ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়াস থেকে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা মদ্যপানে আনন্দবোধ করতেন। ইয়াং বেঙ্গলের উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন- কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালিপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

আধুনিক যুগ

❑ বাংলা একাডেমি

১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। বাংলা একডেমিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। 'The Bengali Academy Act-1957' এর মাধ্যমে একাডেমিটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' চালু করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে 'একাডেমী' বানানের পরিবর্তে 'একাডেমি' বানান চালু করা হয়।

আধুনিক যুগ

❑ বাংলা একাডেমির প্রকাশিত পত্রিকা ৬ টি। যথা-

ক্রমিক নম্বর	পত্রিকার নাম	প্রকাশের ধরন	বিষয়
০১	বাংলা একাডেমি পত্রিকা	ত্রৈমাসিক	গবেষণামূলক
০২	উত্তরাধিকার	মাসিক	সৃজনশীল সাহিত্য
০৩	ধান শালিকের দেশ	ত্রৈমাসিক	কিশোর সাহিত্য
০৪	বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা	ষাণ্মাষিক	বিজ্ঞান বিষয়ক
০৫	বার্তা	মাসিক	মুখপত্র
০৬	বাংলা একাডেমি জার্নাল	ষাণ্মাষিক	-

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

❑ যুগসন্ধিক্ষণের কবি

- তাঁর লেখনিতে মধ্য এবং আধুনিক এই দুই যুগের বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে বলে তাঁকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।
- তিনি আধুনিক মানসিকতা যেমন পুরাপুরি ধারণ করতে পারেননি আবার একই সাথে মধ্যযুগের মানসিকতাও বর্জন করতে পারেননি।
- তিনি কবিতায় নারী শিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গ, বিধবা বিবাহের বিরোধীতা, আধুনিক আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্রুপ করেছেন। এগুলো ছিল মধ্যযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য।
- আবার তাঁর কবিতায় দেশপ্রেম, মাতৃভাষা প্রীতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যায়। যেমন: 'স্বদেশ' কবিতায় লিখেছেন-

'জাননা কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে।।

এভাবে দুই যুগের মিলনকারীরূপে তিনি সাহিত্যে অবদান রেখেছেন বলে তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

[illegible]: [illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible] [illegible]
- ✓ [illegible] [illegible]
- ✓ [illegible] [illegible] [illegible]
- ✓ [illegible] [illegible] ([illegible])
- ✓ [illegible]

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

❑ সাহিত্যকর্ম

বাংলা গদ্য অবলম্বনে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'আলালের ঘরের দুলাল' যা বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার জন্ম দেয়। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের আলোচনা করা হলো-

উপন্যাস		
▪ আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ▪ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯) ▪ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৮) ▪ ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮)	▪ রামারঞ্জিকা (১৮৬০) ▪ কৃষিপাঠ (১৮৬১) ▪ অভেদী (১৮৭১) ▪ বামাতোষিণী (১৮৮১)	▪ গীতাঙ্কুর (১৮৬১) ▪ যৎকিঞ্চিত (১৮৬৫) ▪ আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

আলালের ঘরের দুলাল

প্যারীচাঁদ মিত্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস। এটি ১৮৫৮ সালে পুস্তিকা আকারে প্রকাশের পূর্বে তাঁরই সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' তে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ 'The Spoiled Child'. অনেকের মতে, এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। তবে একটি সার্থক উপন্যাসের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা ছিল এ উপন্যাসে সেই সব বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নকশা জাতীয় উপন্যাস বলেই অনেক সমালোচক বর্ণনা করেছেন।

এ উপন্যাসে লেখক নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন যা 'আলালী ভাষা' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে।

তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় নকশাধর্মী বর্ণনাতে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মতিলাল। সে বাবুরামের অতি আদরের সন্তান। অসৎ সঙ্গ এবং কুশিক্ষার কারণে মতিলালের অধঃপতন ঘটে। পরবর্তীতে তার বোধোদয় হয় এবং ধর্মের দিকে ঝুকে পড়ে। অন্যদিকে মতিলালের অনুজ রামলাল আদর্শ চরিত্র। মতিলালের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সুশৃঙ্খল জীবনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ সাহিত্যকর্ম

অনুবাদ গ্রন্থ	মৌলিক গ্রন্থ	শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্যবই
▪ বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)	▪ প্রভাবতী সম্ভাষণ	▪ বর্ণপরিচয় (১ম, ২য় ভাগ ১৮৫৫)
▪ মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০)	▪ নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮)	▪ বোধোদয় (১৮৫১)
▪ বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮)	▪ জীবন-চরিত (১৮৯১; মরণোত্তর প্রকাশিত)	▪ ব্যাকরণ গ্রন্থ– ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম – ৪র্থ ভাগ)
▪ সীতার বনবাস (১৮৬০)	▪ রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)	▪ আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩)
▪ জীবনচরিত (১৮৪৯)	▪ শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪)	▪ শব্দমঞ্জুরী (১৮৬৪)
▪ ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)	▪ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)	▪ কথামালা (১৮৫৬)
▪ বোধোদয় (১৮৫১)	▪ বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৫৫)	▪ শ্লোকমঞ্জুরী
▪ কথামালা (১৮৫৬)	▪ “অতি অল্প হইল” এবং “আবার অতি অল্প হইল” দুখানা পুস্তক (১৮৭৩)	▪ ঋজুপাঠ
▪ শকুন্তলা (১৮৫৪)	▪ ব্রজবিলাস, যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য (১৮৮৪)	▪ বাংলা অভিধান
▪ চরিতাবলী (১৮৫৭)	▪ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সংস্কার

❑ বিধবা বিবাহ সংস্কার

- তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে **'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'** শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।
- ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবরে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাস করার জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান।
- বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধায়নে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৭০ সালে বিদ্যাসাগর নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেন যে, শুধু কথায় নয় কাজেই তিনি বিধবা বিবাহ চান।
- 'বিধবা বিবাহ সিদ্ধ'- এমন আইন হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে গেছেন।
- ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ নারীশিক্ষায় অবদান

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংকওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ভারতের প্রথম ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত।
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
- গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্ত্রী শিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ১৮৫৮ সালে মে মাসের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করত। পরবর্তীকালে তিনি সরকারের কাছে ধারাবাহিক তদবির করলে সরকার এই স্কুলগুলোর কিছু আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়।
- এরপর কলকাতায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত) এবং নিজের মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ শিক্ষা সংস্কার

- শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার করেছিলেন সেগুলি হল- পাঠক্রম সংস্কার, গণিতে ইংরেজির ব্যবহার, দর্শনে পাশ্চাত্য লজিকের প্রবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন, বিরতি দিবসের পরিবর্তন প্রভৃতি।
- তিনি স্কুল বিভাগের সর্বস্তরের জন্য নতুন করে বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই লিখেছিলেন।
- বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তাঁর হাত ধরেই। পদ্যের মতো গদ্যেও তিনি যতি চিহ্ন ব্যবহার করে গদ্যকে ছন্দবদ্ধ করেছেন।
- শিক্ষা সংস্কারে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম- বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), বর্ণপরিচয় (১ম, ২য় ভাগ ১৮৫৫), ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম – ৪র্থ ভাগ), আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩), শ্লোকমঞ্জুরী, ঋজুপাঠ।

❑ বাল্যবিবাহ রোধ

- ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে জোর প্রচার শুরু করেন এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন পত্র সরকারের কাছে পেশ করেন।
- প্রধানত বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকারি আইন প্রণয়ন করে কন্যার বিবাহের বয়স সর্বনিম্ন দশ বছর নির্ধারিত করা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলার কারণঃ

বাংলা গদ্যে লালিত্য ও নমনীয়তা দান করে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিকরূপ নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলা, রূপময়, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনি প্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। তাঁরই বলিষ্ঠ প্রতিভার জাদুস্পর্শে বাংলা পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ অধিগ্রহণ করেছে। গদ্যে অস্থির গতি অতিবাহিত করে স্থিরতার পর্যায়ে পৌঁছে। গদ্যচর্চার ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে গদ্যের সমস্ত জটিলতা দূরীভূত হয়েছে। গদ্যের সাবলীল রূপ দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার। তিনি ১৮৪৭ সালে বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন। তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিরাম বা যতিচিহ্নের প্রবর্তকও বলা হয়। তিনি প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। তাঁর পরিকল্পিত সাধু ভাষা আদর্শ সাধু ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। গদ্য সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে শৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও যতি চিহ্নের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী'বলে অভিহিত করেছেন।

রামমোহন

চাঁদ

নবাবগঞ্জ

চার্চির কুণ্ডলী

শ্রীনি মাধুর্য

মালতি

কামলতা

মধুসূদন সাবুলাল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদানঃ

যার হাতের ছোঁয়ায় বাংলা গদ্য রূপময় হয়ে ওঠে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান নিম্নভাবে মূল্যায়ন করা যায়:

(ক) বাংলা গদ্যের লালিত্য ও নমনীয়তা দান করে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সাহিত্যিকরূপ নির্মাণ করেন।

(খ) বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস রীতি বিশুদ্ধভাবে নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন।

(গ) পূর্ববর্তী পদ্যে যতিস্থাপন ছিল বিরল, বিরাম চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার নির্দেশ করে তিনিই প্রথম বাংলা পদ্যের নিজস্ব ছন্দরূপটি আবিষ্কার করেন।

(ঘ) গদ্যে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে তিনি ভাষাকে সমৃদ্ধ, সরল ও আর্কষণীয় করে তোলেন।

(ঙ) তিনি প্রমিত সাধু রীতির প্রচলন করেন।

(চ) সুশৃঙ্খল শব্দবিন্যাস রীতি প্রচলন ও প্রয়োগ করেন।

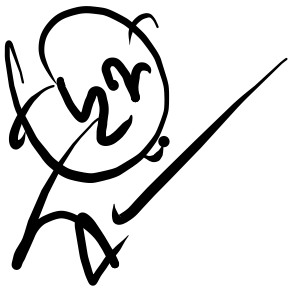

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	নাটক	সম্পাদিত পত্রিকা	প্রহসন
▪ মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ▪ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০) ▪ ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) ▪ বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) ▪ চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)	▪ শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ▪ পদ্মাবতী (১৮৬০) ▪ কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ▪ সুভদ্রা (নাট্যকাব্য) ▪ মায়াকানন (১৮৭৪)	▪ Spectator ▪ Hindo Patriot ▪ Athenaeum ▪ Hindu chronicle	▪ একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০) ▪ বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) **ইংরেজি কাব্য** ▪ The Captive Ladie (১৮৪৯)

[illegible]

[illegible]

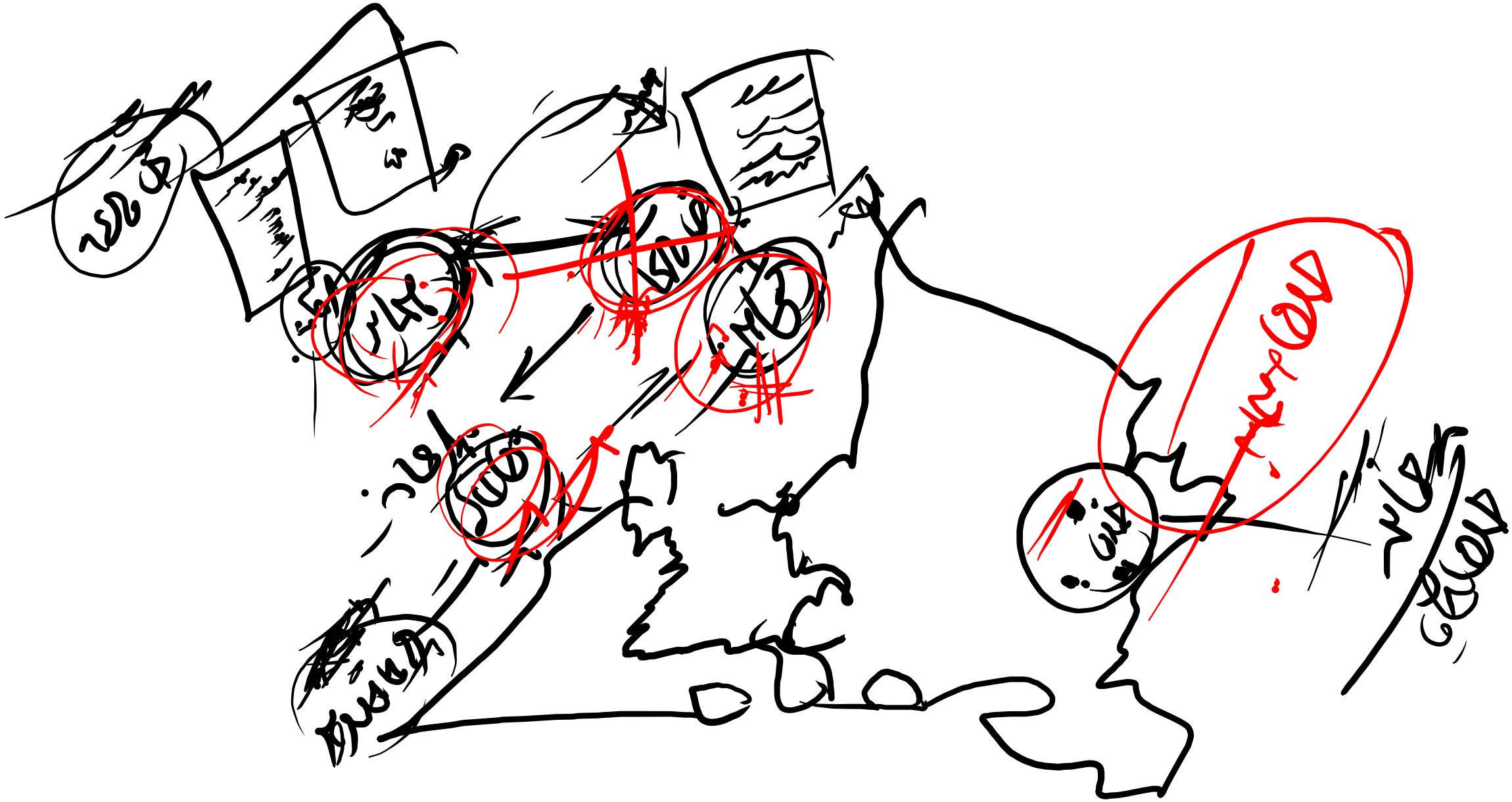

[illegible]

[illegible]

Welcome

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

☐ মেঘনাদবধ কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ-শতকীয় বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একটি মহাকাব্য। কাব্যটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি ১৮৬১ সালে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি মোট নয়টি সর্গে বিভক্ত। মেঘনাদবধ কাব্য হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত, যদিও এর মধ্যে নানা বিদেশি মহাকাব্যের ছাপও সুস্পষ্ট। এটি মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এর প্রধান কাহিনি নেওয়া হয়েছে 'রামায়ণ' থেকে।

এখানে তিন দিন ও দুই রাতের একটি ঘটনা কাব্যিক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ঘটনাটি রামায়ণ থেকে অনুকরণকৃত। রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করেছে রাবণ। সীতাকে উদ্ধারের জন্যে রাম তার ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধে রাবণের সন্তান বীরবাহু এবং কুম্ভকর্ণ মারা গেছে। রাবণের স্ত্রী মন্দোদারী হাহাকার করছে। রাবণের আরেক সন্তান মেঘনাদ তার স্ত্রী প্রমীলাকে নিয়ে উদ্যানে বিলাসিতায় মত্ত ছিল। দেশাত্মবোধের কারণে সে তার আরাম ত্যাগ করে যুদ্ধে এসেছে। কিন্তু নিজের চাচা বিভীষণের চক্রান্তে অগ্নিদেবের মন্দিরে নিরস্ত্রভাবে লক্ষণের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুতে স্ত্রী প্রমীলা চিতারোহণ করেছে। মাইকেল নয়টি সর্গ বা অধ্যায়ে তার এ কাব্যটি রচনা করেন। প্রথম সর্গ অভিষেক, শেষ সর্গ সয়ংস্ক্রিয়া।

মূলত ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রের উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন রচনা করেন এই স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' শুধু একটি মহাকাব্যই নয়-এটি একটি দেশপ্রেমের প্রতীক, একটি ধর্মীয় বিরোধ। সত্য-মিথ্যার মাঝে বিদ্রোহী এ এক অমর মহাকাব্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)

বীরাঙ্গনা কাব্য'টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। এই কাব্যে ১১জন নারীর ১১টি পত্র আছে। চরিত্র – দ্রৌপদী, জাহ্নবী, শূর্পনখা, রুক্মিণী, তারা, ভানুমতী, জনা, কৈকেয়ী, ঊর্বশী, শকুন্তলা প্রমুখ। দত্তকুলোদ্ভব কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরাঙ্গনা'- ইতালীয় কবি ওভিদের Heroides কাব্যের আদর্শানুসারে লিখিত পত্রকাব্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কবিতাগুলোকে Dramatic monologue জাতীয় কবিতা বলা যায়। এ কাব্যে কবি সরল ও আবেগময় ভাষায় নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় তাঁর লিরিক ক্ষমতাটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। মধুসূদন এগারটি পত্র পূর্ণ করেছিলেন। আরও কয়েকটির সূত্রপাত করলেও তার পক্ষে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ওভিদের কাব্যের নায়িকারা তাদের পতি বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে প্রধানত প্রেম-উদ্বোধিত চিত্তে পত্ররচনা করেছে। মধুসূদন এদেশের পৌরাণিক নারীচরিত্র উপজীব্য করে পত্ররচনা করেছেন। তবে কবি সেসব চরিত্র নিজের আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন। পত্রগুলোর কোন নারী নিষিদ্ধপ্রেমে উন্মাদিনী, কেউ প্রিয়সঙ্গলাভের জন্য কামাতুরা, কেউবা দুর্বল ভীরু স্বামীর প্রতি তীব্র বাক্যবাণবর্ষণে অকৃপণা। বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্রগুলোতে কামনার রক্তরাগ এবং চরিত্রের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্রগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কোথাও নায়িকার প্রেমানুভূতির বেদনাকাতর রূপটি ফুটে উঠেছে। যেমন- 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে বনবাসিনী শকুন্তলার আবেদন :

কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব, সেবিবে
পা দু খানি-দাসীভাবে, এই লোভ মনে,
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দের দিক থেকে চরম সার্থকতা লাভ করেছেন। এমন কি 'মেঘনাদবধ কাব্যের' ছন্দ থেকেও এতে অধিক কৃতিত্ব বিদ্যমান।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ নামে সনেট জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে মধুসূদন বাংলা কাব্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেছেন। এখানে সংকলিত সনেটের সংখ্যা ১০২টি। কবিতাগুলো প্রবাসে রচিত। কয়েকটি কবিতায় পেত্রার্কের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করা হলেও বাকী গুলোতে সেক্সপিয়ারের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে। বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, আশা প্রভৃতি বিখ্যাত সনেট এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবির স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষাপ্রীতি গভীর মমতায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন: বঙ্গভাষা কবিতায় কবি বলেছেন-

“হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি।
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচারি
কাটাইনু বহুদিন সুক পরিহরি।”

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

একেই কি বলে সভ্যতা?

‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রহসনে সভ্যতার নামে উঠতি বয়সী তরুণদের সুরা পানসহ নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র – নববাবু এবং অন্যান্য চরিত্র– চৈতন্য, বালাই, কালীনাথ, নবকুমার, বাবাজী, নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং কর্তা মশায়।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

❑ সাহিত্যকর্ম

নাটক	প্রহসন	গল্প	কাব্যগ্রন্থ
▪ নীলদর্পণ (১৮৬০) ▪ নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) ▪ লীলাবতী (১৮৬৭) ▪ কমলে কামিনী (১৮৭৩)	▪ সধবার একাদশী (১৮৬৬) ▪ বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ▪ জামাই বারিক (১৮৭২)	▪ যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (১৮৭২) ▪ পোড়া মহেশ্বর (১৮৭২)	▪ সুরধুনী কাব্য (প্রথম ভাগ –১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ– ১৮৭৬) ▪ দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)

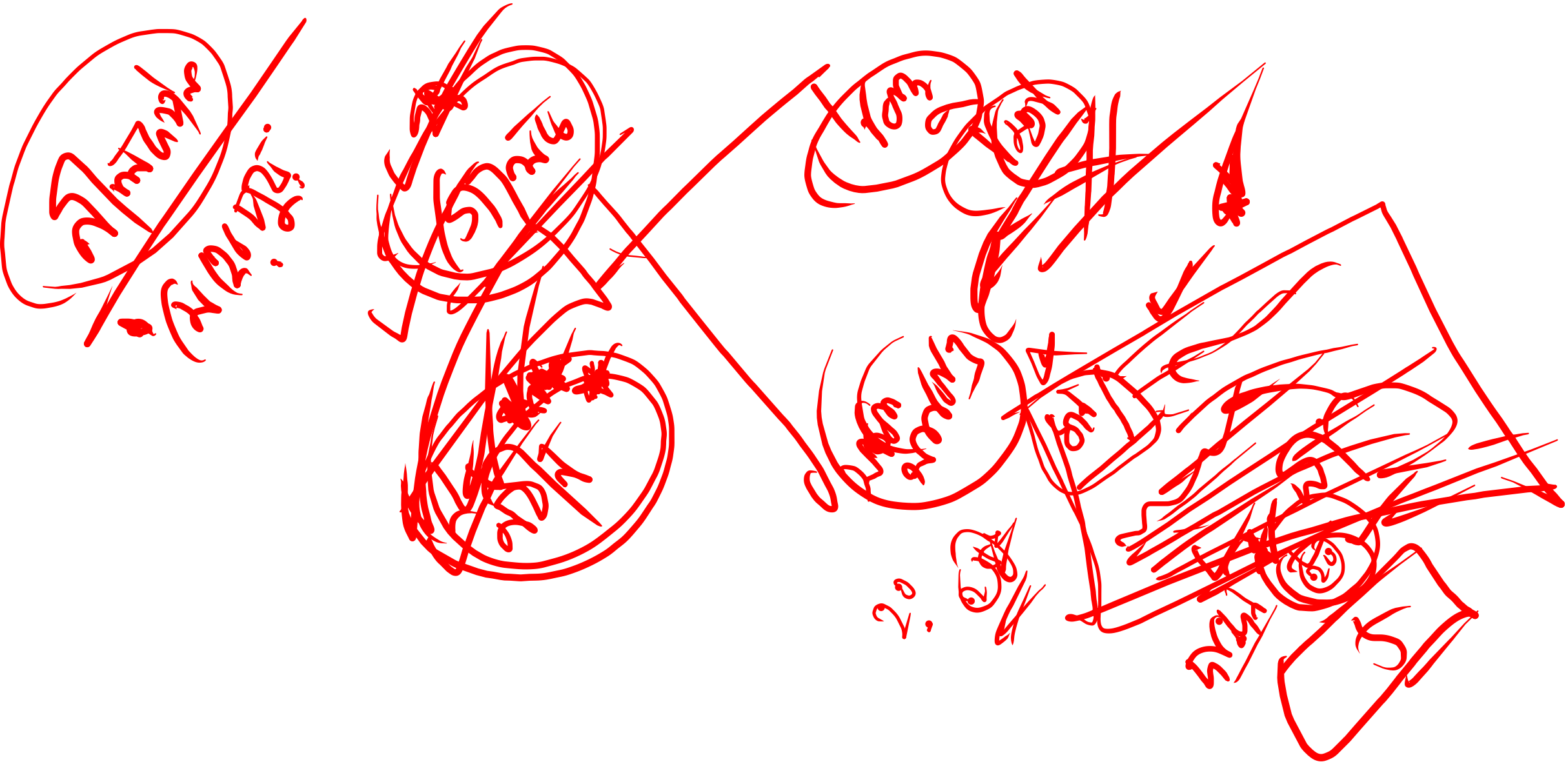

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

❑ নীল দর্পণ

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'নীল দর্পণ'। এটি একটি সামাজিক নাটক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে। নাটকটি তিনি নীলকর সাহেবদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হলো বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার দুর্বিষহ নির্যাতনের কাহিনি। কিভাবে কৃষক গোলকমাধবের পরিবার নীলকরদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল এবং সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হল, তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। তোরাপ চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র; বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুব কমই আছে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। এটিতে কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর অঞ্চলের নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

‘নীল দর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার ‘ইন্ডিগো কমিশন’ বা ‘নীল কমিশন’ বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই নাটকের সঙ্গে হ্যারিয়েট স্টো-এর ‘আঙ্কল টমস্ কেবিন’ গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। মনে করা হয়ে থাকে, ‘নীল দর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘Nil Darpan, or The Indigo Planting Mirror’ নামে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বইটির প্রকাশক জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

❑ সধবার একাদশী

বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি আদি ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'সধবার একাদশী'। এটি একটি নাতিদীর্ঘ নাটক যা কি-না প্রহসন হিসেবে পরিগণিত হয়। এতে তিনটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে ২টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি এবং তৃতীয় অঙ্কে ৩টি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। নাটকটির চরিত্রসমূহ – নিমচাঁদ, অটল বিহারী (কেন্দ্রীয় চরিত্র), জীবনচন্দ্র। ১৮৬৮ সালে এটি প্রথম কলকাতার বাগবাজার 'অ্যামেচার থিয়েটার' দলের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।

'সধবার একাদশী' নাটকের মাধ্যমে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি বর্গের চাল-চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের কুফল ফুটিয়ে তোলা এ নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজের বেশ্যাবৃত্তির বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপান এবং বেশ্যার কারণে সামসময়িক সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নৈতিক অধঃপতন দেখা গিয়েছিল তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। উঠতি ধনী ব্যক্তিরা অর্থ ও বিত্তের জোরে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে যে অনাসৃষ্টি করে তারই একটি বিশ্বস্ত রূপ এই 'সধবার একাদশী'।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ – ১৮৯৪)

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
▪ স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮) ▪ সঙ্গীত শতক (১৮৬২) ▪ বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)	▪ নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০) ▪ বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০) ▪ প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০)	▪ সারদামঙ্গল (১৮৭৯) ▪ মায়াদেবী (১৮৮২) ▪ ধূমকেতু (১৮৮২)	▪ বাউল বিংশতি (১৮৮৭) ▪ সাধের আসন (১৮৮৯) ▪ গোধূলি (১৮৯৯)

❑ গীতিকবিতা

যে শ্রেণির কবিতায় কবি ব্যক্তিগত বা আপন হৃদয়ের অনুভূতি নিজের একান্ত কামনা, বাসনা ও আনন্দ বেদনা প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগ কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাব মূর্তিতে প্রকাশ করে সেই শ্রেণির কবিতাকে গীতিকবিতা বলে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "গীতি কবিতায় একটি মাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলমল করিয়া ওঠে।" গীতি কবিতা মন্ময় কবিতার অন্তর্গত।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ – ১৮৯৪)

গীতি কবিতায় বিহারীলালের অবদান:

আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত ঈশ্বরগুপ্তের হাতে। কিন্তু তাঁর হাতে গীতিকবিতা সফল রূপ পায় নি। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দুটোতেও গীতিকবিতার লক্ষণ ফুটে উঠে। তারপর বাংলা কবিতার আকাশে ভোরের পাখি নামে খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তিনি বাংলা গীতিকাব্য ধারায় সতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই আধুনিক গীতিকবিতার জনক এবং সচেতন গীতিকবি। তাঁর 'সংগীত শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিণী', 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি সার্থক গীতিকাব্য। সফল গীতি কবিতার যে ধারা বিহারীলালের হাতে সূচনা হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। বিহারীলালের গীতি কবিতা পাঠককে মন্ময় করে রাখে। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কবি বলেছেন,

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালা ফালা,
উহ্! কী জলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- **জন্ম** : ১৮৭৬ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি দেবানন্দপুরে।
- **অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক** : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি চব্বিশ বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।
- **ছদ্মনাম** : অনিলা দেবী (ডাকনাম : ন্যাঁড়া)।
- **তাঁর লেখা প্রথম গল্প** : মন্দির
- **তাঁর প্রথম উপন্যাস** : বড়দিদি
- **তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ও আত্মজৈবনিক উপন্যাস** : শ্রীকান্ত (৪ খণ্ড)
- **সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যে উপন্যাসটি** : পথের দাবী
- **নারীর অধিকার প্রবন্ধ** : নারীর মূল্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- **উপন্যাস** : শ্রীকান্ত (১ম-৪র্থ খণ্ড), চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, বড়দিদি, গৃহদাহ, দেবদাস, দত্তা, দেনা-পাওনা, শেষপ্রশ্ন, পথের দাবী, শুভদা, শেষের পরিচয়, পণ্ডিতমশাই, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, বিরাজ বৌ, বিপ্রদাস।
- **গল্প** : মন্দির, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, বিলাসী।
- **উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ** : নারীর মূল্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❖ **উপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নঃ** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাস যেন এক অনবদ্য শিল্পের নাম। তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, সমাজচিত্র, রাজনৈতিক চেতনা, অসামান্য জীবন দর্শন এক কথায় মানবজীবনের প্রতিটি দিক মূর্ত। গৃহদাহ যেমন রাজনৈতিক উত্তাপে ভরপুর অন্যদিকে দেবদাস আবার প্রেম বিরহের এক গাঁথা। শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎ মানব জীবনের এক মহৎ শিল্পী। পল্লীসমাজে তুলে ধরেছেন গ্রামীণ কুটিলতা, হিংসা-বিদ্বেষ, সর্বোপরি আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের এক অপূর্ব দলিল এটি। সর্বোপরি, শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী।

লেকচার-০৭

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত যে-কোনো গ্রন্থের সমালোচনা লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক যেকোনো গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিপিবদ্ধ করুন। [৪০তম বিসিএস]
- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অথবা 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের গ্রন্থ সমালোচনা লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী? [৩৭তম বিসিএস]
- বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোকঐতিহ্য নির্ভর একটি গ্রন্থের সমালোচনা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- রবীন্দ্র-ছোটগল্পভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন। [৩৫তম বিসিএস]
- 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]

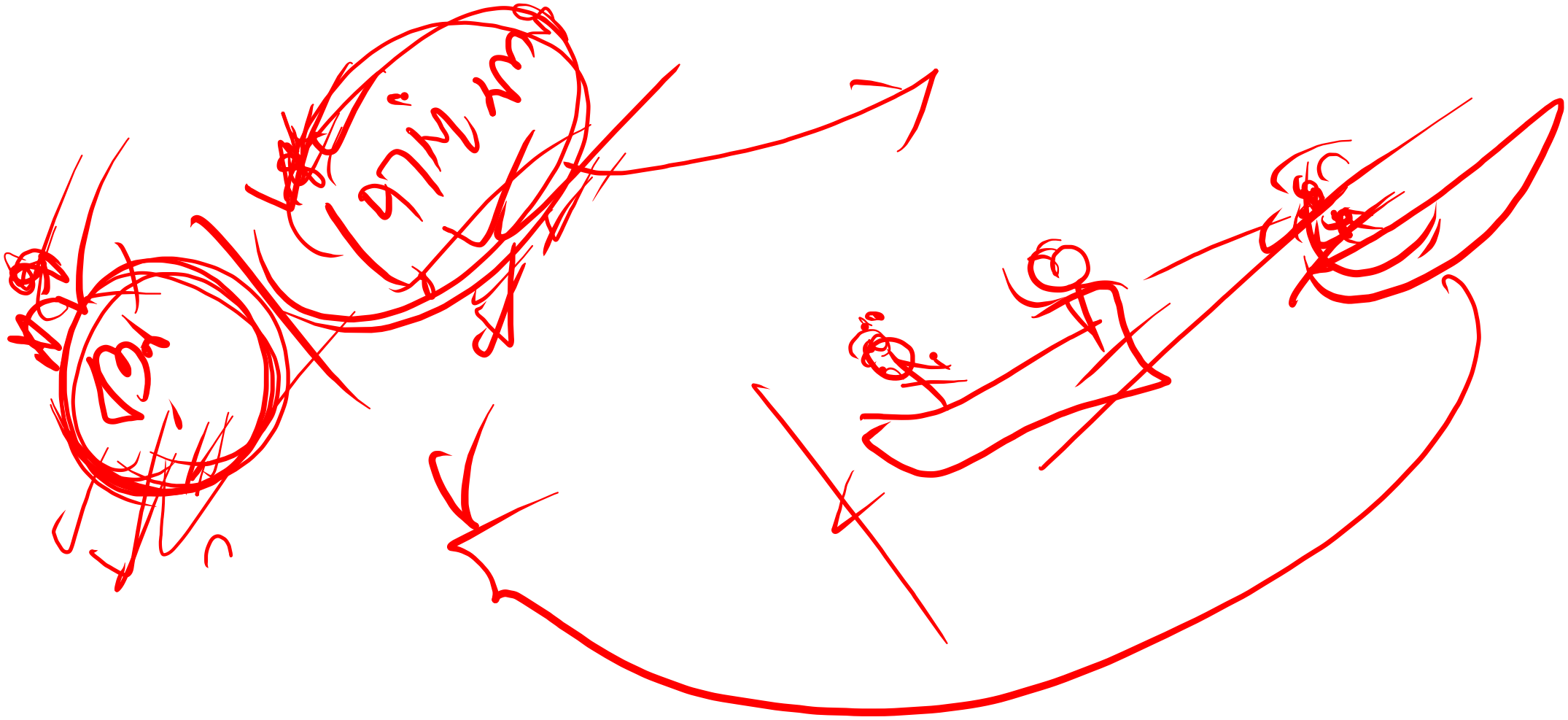

১। বিধি
২। সংবিধান (ক)
৩। অনুচ্ছেদসমূহ (খ)
৪। ধারা ২৪৯ (গ)
ক্ষ তথ্য (ঘ)

[illegible]

১ [illegible]

২ [illegible]

৩ [illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে।

পিতা ও মাতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবী।

জন্মক্রম : বাবা-মা'র চতুর্দশতম সন্তান এবং অষ্টম পুত্র।

শিক্ষা : বিভিন্ন শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়লেও কোথাও মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত আবার বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ১৮৭৮ সালে মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমে ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে কিছুদিন ব্রাইটনে এবং পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে মাস তিনেক ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করেন।
- কিন্তু দেড় বছর পর পিতার নির্দেশে শিক্ষা অসম্পন্ন রেখে স্বদেশে ফিরে আসেন (১৮৮০)।
- দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে (১৮৮১)। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করেননি।

লেখালেখির সূচনা: আট বছর বয়সে কবিতা রচনার সূত্রপাত। তেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'অমৃতবাজার' নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকায় (১৮৭৪)। কবিতাটির নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'।

শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি 'ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯০১ সালে আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' বা 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ এক নজরে রবীন্দ্র সাহিত্য

➢ কাব্য	– ৫৬ টি
➢ উপন্যাস	– ১২ টি
➢ নাটক	– ২৯ টি
➢ কাব্যনাট্য	– ১৯ টি
➢ ছোটগল্প	– ১১৯ টি
➢ গীতিপুস্তক	– ০৪ টি (মোটগান – ২২৩২ টি)
➢ ভ্রমণকাহিনী	- ০৯ টি
➢ চিঠিপত্রের বই	– ১৩ টি

❖ এছাড়া আত্মজীবনী ও প্রবন্ধ সাহিত্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
✓ কবি-কাহিনী (১৮৭৮)	✓ মানসী (১৮৯০)	✓ খেয়া (১৯০৬)	✓ গীতবিতান (১৯৩১)
✓ বনফুল (১৮৮০)	✓ সোনার তরী (১৮৯৪)	✓ গীতাঞ্জলি (১৯১০)	✓ পুনশ্চ (১৯৩২)
✓ প্রভাত সংগীত (১৮৮৩)	✓ চিত্রা (১৮৯৬)	✓ উৎসর্গ (১৯১৪)	✓ জন্মদিনে (১৯৪১)
✓ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)	✓ ক্ষণিকা (১৯০০)	✓ বলাকা (১৯১৬)	✓ শেষ লেখা (১৯৪১)
✓ কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)	✓ নৈবেদ্য (১৯০১)	✓ পূরবী (১৯২৫)	

উপন্যাস			
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	রাজনৈতিক উপন্যাস	মিস্টিক ও রোমান্টিক জাতীয় উপন্যাস	ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস
✓ চোখের বালি (১৯০৩)	✓ গোরা (১৯১০)	✓ চতুরঙ্গ (১৯১৫)	✓ বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩)
✓ নৌকাডুবি (১৯০৬)	✓ ঘরে বাইরে (১৯১৫)	✓ শেষের কবিতা (১৯২৯)	✓ রাজর্ষি (১৮৮৭)
✓ যোগাযোগ (১৯২৯)	✓ চার অধ্যায় (১৯৩৪)	✓ মালঞ্চ (১৯৩৪)	✓ দুই বোন (১৯৩৪)

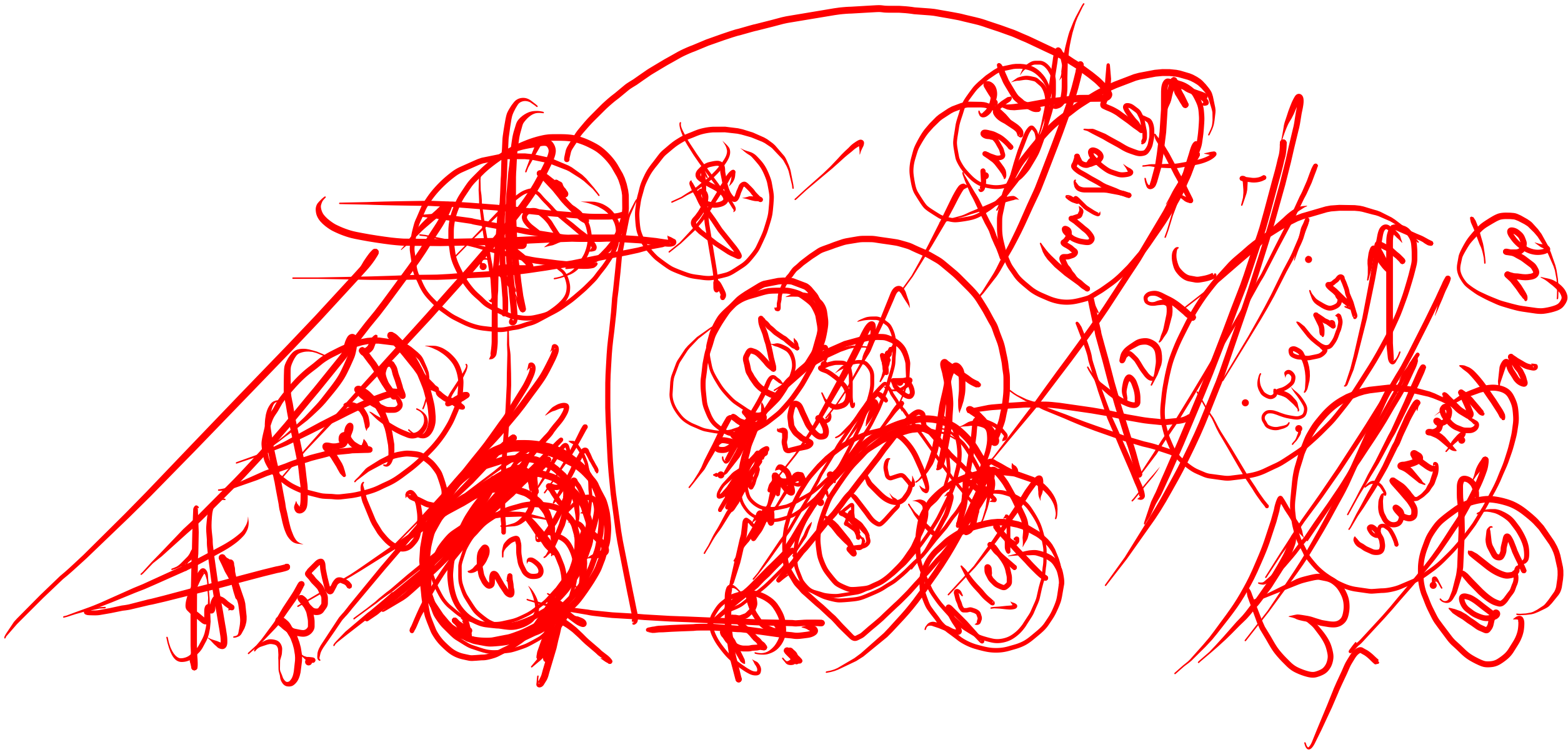

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প					
প্রেমের গল্প		সামাজিক গল্প		অতি প্রাকৃত গল্প	প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কিত গল্প
▪ শেষকথা ▪ সমাপ্তি ▪ নষ্টনীড় ▪ শেষের রাত্রি ▪ মাল্যদান ▪ পাত্র ও পাত্রী	▪ মধ্যবর্তিনী ▪ প্রায়শ্চিত্ত ▪ ল্যাবরেটরি ▪ একরাত্রি ▪ দৃষ্টিদান ▪ চতুরঙ্গ	▪ ছুটি ▪ হৈমন্তী ▪ পোস্টমাস্টার ▪ কাবুলিওয়ালা ▪ ব্যবধান ▪ দিদি	▪ দেনা-পাওনা ▪ পণরক্ষা ▪ কর্মফল ▪ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ▪ মেঘ ও রৌদ্র	▪ ক্ষুধিত পাষাণ ▪ কঙ্কাল ▪ নিশীথে ▪ জীবিত ও মৃত ▪ মণিহারা ▪ গুপ্তধন	▪ শুভা ▪ অতিথি ▪ আপদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক					
রূপক ও সাংকেতিক নাটক	কাব্যনাট্য	প্রহসন/ কৌতুক নাটক	নৃত্যনাট্য	গীতিনাট্য	সামাজিক নাটক
▪ মুক্তধারা ▪ ফাল্গুনী ▪ রক্তকরবী ▪ ডাকঘর ▪ কালের যাত্রা ▪ অচলায়তন ▪ তাসের দেশ ▪ প্রায়শ্চিত্ত ▪ রাজা	▪ বিসর্জন ▪ রুদ্রচণ্ড ▪ প্রকৃতির প্রতিশোধ ▪ মালিনী ▪ রাজা ও রাণী ▪ বিদায় অভিশাপ ▪ নরকবাস ▪ লক্ষ্মীর পরীক্ষা	▪ বৈকুণ্ঠের খাতা ▪ চিরকুমার সভা ▪ হাস্য কৌতুক ▪ ব্যঙ্গ কৌতুক ▪ গোড়ায় গলদ	▪ নটীর পূজা ▪ চণ্ডালিকা ▪ চিত্রাঙ্গদা ▪ শ্যামা ▪ পরিশোধ	▪ বাল্মীকি প্রতিভা ▪ বসন্ত ▪ মায়ার খেলা ▪ কালমৃগয়া	▪ শোধ বোধ ▪ বাঁশরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধ				
রাজনৈতিক		**সাহিত্য বিষয়ক**	**শিক্ষা বিষয়ক**	**ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক**
▪ কালান্তর ▪ সভ্যতার সংকট ▪ রাজাপ্রজা ▪ আত্মশক্তি ▪ ভারতবর্ষ	▪ স্বদেশ ▪ বিশ্বপরিচয় ▪ ইতিহাস ▪ সমবায় নীতি	▪ প্রাচীন সাহিত্য ▪ লোকসাহিত্য ▪ আধুনিক সাহিত্য ▪ সাহিত্য ▪ সাহিত্যের পথে ▪ সাহিত্যের স্বরূপ	▪ শিক্ষা ▪ শিক্ষার হেরফের ▪ বিশ্বভারতী ▪ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ▪ ব্রহ্মচর্যাশ্রম	▪ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ▪ জাপান যাত্রী ▪ রাশিয়ার চিঠি ▪ জাভা যাত্রীর পত্র
ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক		**আত্মজীবনী**		**ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ**
▪ ধর্ম ▪ শান্তিনিকেতন	▪ মানুষের ধর্ম্ম ▪ সঞ্চয়	▪ জীবনস্মৃতি ▪ ছেলেবেলা	▪ ছিন্নপত্রাবলী ▪ ছিন্নপত্র	▪ শব্দতত্ত্ব ▪ ছন্দ ▪ বাংলা ভাষা ▪ পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ কাব্যগ্রন্থ

➢ সঞ্চয়িতা

রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অমর কবিতার সংকলন হলো সঞ্চয়িতা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের সংকলনের কাজ করেন। এই কাব্যে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা। কবিতাগুলো কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। এই কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলো হলো- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, সোনার তরী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, চৈতালি এবং আরও বিভিন্ন কাব্যের কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ হলো ‘গীতাঞ্জলি’। এই কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ‘Song Offerings’। এটি ইংরেজি ভাষায় গদ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংকলনগ্রন্থ। ১৯১২ সালের শেষ দিকে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক ১ম ‘Song Offerings’ প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ স্বীকৃতির ফলে রবীন্দ্র কবিপ্রতিভা বিশ্ব স্বীকৃতি অর্জন করে। ‘Song Offerings’ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন খ্যাতনামা আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস্ (উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি/Song Offerings গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলির সবকটি কবিতা/গানগুলোর অনুবাদ করেননি। উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ কর্মের সঙ্গে আরো আছেন ব্রাদার্স জেমস এবং ব্রিটিশ কবি ও অনুবাদক জো উইন্টার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ অনুবাদে স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন। গীতাঞ্জলি/Song Offerings-এ ১৫৭ টি কবিতা/গান স্থান পেয়েছে। কাব্যটি কবির পরিণত জীবন সঙ্গীতের পবিত্র মাল্য। কাব্যটিতে কবি ঈশ্বরের কাছে নানাভাবে নানামূর্তিতে নিবেদন প্রকাশ করেছেন।

সোনার তরী

রবীন্দ্র ভাবনার নতুন মাত্রা পেয়েছে 'সোনার তরী' কাব্যে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলো পদ্মা পাড়ের শিলাইদহে উপস্থিতকালে রচিত। তাই এই কাব্যে পূর্ব বাংলার নৈসর্গিক চেতনা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা থাকলেও 'সোনার তরী' পর্বে এসে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যোগ হয় জীবন ভাবনা ও নৈসর্গিক চেতনা। এই কাব্যে মোট তেতাল্লিশটি কবিতা রয়েছে। প্রতিটি কবিতায় কবি কোনো এক নিরুদ্দেশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই 'সোনার তরী' কে মহাকালের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কবির ভাষায় 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'। অর্থাৎ মানব জীবনের সকল কিছু একদিন যে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, সেই সত্তাকে ধারণ করা হলো সোনার তরীর রূপকে ধারণ করা। তিনি অভিমত প্রদান করেন যে, পৃথিবী কেবল মানুষের সৃষ্টি কর্মকে গ্রহণ করে, ব্যক্তিকে নয়। তাই তিনি উচ্চারণ করেন—

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই

ছোট সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

মহাকাল কেবল মানুষের কৃতকর্মকেই গ্রহণ করে তাঁকে নয়, এই চরম দার্শনিক সত্তার পরিচয় কবি তুলে ধরেছেন তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ উপন্যাস

➢ চোখের বালি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হলো চোখের বালি। ধারণা করা হয় এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯০১-০২ সালে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বিনোদিনী' নামে প্রকাশিত হয়। বই আকারে 'চোখের বালি' নামে প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। মূলত সমাজ ও যুগযুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধকে উপজীব্য করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এর অন্যতম চরিত্র হলো- মহেন্দ্র, আশালতা, বিহারী, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোরা

রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাসের মধ্যে সর্ববৃহৎ, দ্বন্দ্বমূলক ও জটিল উপন্যাস হলো 'গোরা'। এটি একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৮৮০-এর দশকে ব্রিটিশ রাজত্বকালের কলকাতার পটভূমিতে হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুরোভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণদয়ালের পুত্র গৌরিমোহন ওরফে গোরা। কৃষ্ণদয়াল প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তার মন পরিবর্তন হয়। তিনি একজন গোড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী। আনন্দময়ী নিঃসন্তান ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কৃষ্ণদয়াল ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের রক্ষা করেন। তার বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক আইরিশ নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেই মারা যান। নিঃসন্তান আনন্দময়ী ঐ সন্তানকে আপন করে নেয়। তার নাম রাখে গোরা। গোরাও কৃষ্ণদয়ালের প্রথম জীবনের মতো হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠতে শুরু করলে কৃষ্ণদয়াল তাকে প্রকৃত হিন্দুত্ব শেখানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে গোরার মন পরিবর্তন হয় এবং একসময় গোরা কৃষ্ণদয়ালের চেয়েও রক্ষণশীল হিন্দু হয়ে ওঠে। গোরার অতি রক্ষণশীলতা কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীকে চিন্তিত করে তোলে। গোরার বাল্যবন্ধু বিনয়। সেও গোরার অতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারে না। একসময় গোরা তার চার বন্ধুসহ গ্রাম দর্শনে বের হয়। সেখানে গোরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে। এছাড়া সে দেখতে পায় হিন্দু নাপিতের ঘরে মুসলমান শিশু প্রতিপালনের চিত্র। গ্রামে ইংরেজ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় গোরার জেল হয়। একসময় কৃষ্ণদয়াল প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পরলে সে গোরাকে তার পিতৃপরিচয়ের কথা জানায়। নিজ পরিচয় জানার পর গোরার সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় এবং তার সুবোধ জাগ্রত হয়। নবচেতনায় উদ্ভাসিত গোরার সাথে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কারও আর বিরোধ থাকে না। সে হয়ে ওঠে একজন ভারতবর্ষীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরে বাইরে

স্বদেশি আন্দোলনকে উপজীব্য করে চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস হলো ঘরে বাইরে। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৯১৫ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় একদিকে জাতিপ্রেম ও সংকীর্ণ স্বদেশিকতার সমালোচনা অন্যদিকে সমাজ ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিশেষত পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ উপন্যাসে। একদিকে বাইরে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তেজনা অন্যদিকে তিনটি মানুষের জীবনের টানাপোড়েন- রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুইয়ে মিলে এ উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ প্রমুখ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা। তাঁর স্বামী নিখিলেশ এলাকার জমিদার। নিখিলেশ ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ, তাই স্ত্রীকে পরিধান করিয়েছেন আধুনিক পোশাক এবং তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। তিনি বিমলাকে ভিতরের জগৎ থেকে বাইরের জগতে এনে পরিচয় করিয়ে দিতে চান তবে তিনি স্থির, গম্ভীর ও সাদামাটা ভাবে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ স্বদেশি আন্দোলনের নেতা। তাঁর কথার মাধুর্য অল্প সময়েই যেকোনো মানুষের মন জয় করে নিতে পারত। চারদিকে যখন স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে তখন হঠাৎ করে নিখিলেশের বাড়িতে হাজির হন তার পুরনো বন্ধু সন্দীপ। দুই বন্ধু দুই আলাদা চেতনায় বিশ্বাসী। নিখিলেশ প্রগতিশীল, সন্দীপ প্রতিক্রিয়াশীল।

সন্দীপের নিখিলেশের বাড়িতে আসার কারণও ছিল গ্রামে স্বদেশি আন্দোলনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। তার চরিত্রে কৃতঘ্নতারও চিহ্ন পাওয়া যায়। সন্দীপের বাড়িতে আসার পর স্বামী বাদে প্রথম কোনো পরপুরুষের সঙ্গ পায় বিমলা। সে সন্দীপের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সন্দীপ সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিমলার কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় আন্দোলনের দোহাই দিয়ে। পরে গ্রামে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। সে অবস্থায় বিমলার সন্দীপের প্রতি দুর্বলতার ভ্রম কাটে। সে তার আন্দোলনের ফাঁকে ধূর্ততা টের পেয়ে যায়। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে যায়। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিখিলেশকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

➢ শেষের কবিতা

এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত রোমান্টিক কাব্য-উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯২৭-১৯২৮ সাল অবধি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে 'Farewell, My Friend' শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। এই উপন্যাসে ১৬টি কবিতা এবং ৩৯৪টি কাব্যচরণ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র- অমিত রায়, কেতকী, শোভনলাল, লাবণ্য, অবনীশদত্ত প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ ছোট গল্প

➢ পোস্টমাস্টার

এটি 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি গল্পটি শাহজাদপুর কুঠিবাড়ির পোস্ট অফিসের একটি ঘটনা অবলম্বনে শিলাইদহে বসে লেখেন। এই গল্পের চরিত্র ২টি- পোস্টমাস্টার এবং রতন। গ্রামের নতুন পোস্ট অফিসে কলকাতার একজন পোস্টমাস্টার হিসেবে আসেন। পিতৃমাতৃহীন রতন নামের অনাথ বালিকা পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করার দায়িত্ব পায়। ধীরে ধীরে রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পোস্টমাস্টারের বদলির আদেশ এলে রতন তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে প্রত্যাখাত হয়। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সময় একবার ফেরত গিয়ে রতনকে নিয়ে আসতে চাইলেও পরক্ষণেই তার উপলব্ধি জন্মে- যা এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একটি অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে বলেন, "জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য একটি রচনা হলো 'হৈমন্তী'। গল্পটি সাধুরীতিতে এবং উত্তমপুরুষের বর্ণনায় লেখা। গল্পকথক অপু গল্পের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী। হৈমন্তীর আরেক নাম শিশির। তাকে ঘিরেই গল্পের প্লট নির্মিত। গল্পে ওই সমাজের এমন কিছু দুষ্টু ক্ষত চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অন্যায় অনুশীলনের নির্মম শিকার হৈমন্তী।

বাঙালি হিন্দু সমাজে যখন এগারো এরপরই মেয়েদের বিবাহের বয়স পার হয়ে গেছে বলে ধরা হয়, তখন সতের বছরের হৈমন্তীকে সমাজ বুড়ি খেতাবই দিয়ে ফেলেছে। তবুও কন্যার বাবা ভালো পাত্রের সন্ধানে সবুর করতে চাইলেন। কিন্তু বরের বাবা সবুর করতে চাইলেন না। সম্পদের লোভে ও বড় অঙ্কের পণ নিয়ে এক সময়ে রাজার ভৃত্য বড়লোক বাপের একমাত্র কন্যা হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। মেয়ের বাপের সম্পদের লোভে পুত্রবধূর অধিক বয়স মেনে নিলেও সমাজ তা মেনে নেয়নি। সত্যবাদী হৈমন্তী সবার সামনে শাশুড়ির কথার বিরুদ্ধে নিজের আসল বয়স বলে দিলে সমস্যার শুরু হয়। তবুও একসময় কন্যার বাপের সমস্ত ধনদৌলত পাওয়ার কথা মাথায় রেখে সমস্যা বাড়লো না। যখন সংবাদ আসলো, কন্যার বাপের বিশাল ধনভান্ডারের কাহিনি ভুয়া তখন থেকেই হৈমন্তী শুলে চড়লো। সবাই মিলে তার জীবন নরক বানিয়ে ছাড়লো। যখন হৈমন্তীর বাবা গৌরীশঙ্কর তাকে নিতে আসে, অপুর পরিবার বিবাহের আগের সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে যেতে দেয় না এবং উল্টো হুংকার ছুড়ে। শেষ পর্যন্ত হৈমন্তীকে নিয়ে তার বাবা চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও স্বামী হয়ে অপু কিছুই করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➤ ছুটি

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী ছোটগল্পের মধ্যে অন্যতম ছুটি। এই গল্প 'ফটিক' নামের এক বালককে ঘিরে। ফটিক ১২ বছরের এক দুরন্ত গ্রাম্যবালক। একদিন কলকাতা থেকে তার মামা বিশ্বম্ভরবাবু গ্রামে এসে ভাগ্নের অবস্থা দেখে তাকে শহরে ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য নিজের কাছে নিয়ে আসে। কলকাতায় এসে সে বুঝতে পারল তার মামি তাকে গ্রহণ করেনি। মামাতো ভাই-বোনেরা তাকে এড়িয়ে চলে। কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। বই না থাকায় স্কুলে মার খেলে একদিন মামিকে বই কিনে দেওয়ার কথা বলে। মামির কটাক্ষে সে খুব কষ্ট পায়। ফটিক জ্বরে আক্রান্ত হলে মামিকে জ্বালাতন করতে চায়নি। গাঁ পোড়া জ্বর নিয়ে কাউকে না বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। মামা অনেক খোঁজাখুজি করে না পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। গ্রাম থেকে তার মা আসে। ফটিককে খুঁজে পাওয়া যায়। ততদিনে জ্বর আরও বেড়ে অবস্থা আরো খারাপ হলে সে মায়ের কোলে মাথা রেখে বলে ' মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' এর পরপরই ফটিকের করুণ মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ নাটক

➢ চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এই নৃত্যনাট্যটির সঙ্গে ১৮৯২ সালে রচিত চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব এক ও অভিন্ন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান নিয়ে কিছু রূপান্তরসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন কাব্যনাটকটি। মণিপুর রাজকুলে যখন পুত্র সন্তান না হয়ে কন্যা সন্তান চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতিবিদ্যাও। আর এর ফলে চিত্রাঙ্গদা পুরুষের সবল মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকলেও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যখন বার বছরের জন্যে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সময় ভ্রমণ করতে করতে এলেন মণিপুররাজ্যে তখন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রেমে অনুরক্ত হলেও বাহ্যিক সৌন্দর্যের অভাবে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে অগ্রাহ্য করেন। এতে অপমানিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রেমের দেবতা মদন এবং যৌবনের দেবতা বসন্তের কাছে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে রুক্ষ চিত্রাঙ্গদা হয়ে উঠেন অসামান্যা সুন্দরী এবং যথারীতি অর্জুন তার ব্রত ভেঙ্গে সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন। কিন্তু ক্রমশ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে দ্বৈত স্বত্ত্বার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এজন্যে যে অর্জুন তাকে বাহ্যিক রূপের কারণে ভালোবাসে যেখানে চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত অস্তিত্ব অবহেলিত। এর মধ্যে মণিপুর রাজ্যের বিপদের আভাসে একসময় অর্জুন নারীর মমতায় প্রজা বৎসল, সাহসে শক্তিতে পুরুষের মতো সবল চিত্রাঙ্গদার কথা লোকমুখে জানতে পারে। একজন পুরুষ মনে একজন রমণীয় সবল নারীকে দেখার উদ্‌গ্রীব বাসনায় অর্জুন প্রকাশ করে তার আগ্রহ। চিত্রাঙ্গদাও নিজেকে অর্জুনের কাছে প্রকাশ করে। পরিশেষে এ উপলব্ধি হয় যে, বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মানুষের চারিত্রিক শক্তি এবং এতেই প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্থায়ী পরিচয় হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ প্রবন্ধ

➢ কালান্তর

প্রবন্ধ সংকলন 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৯৩৭ অব্দ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি; দীর্ঘ তেইশ বছরের রবীন্দ্রচিন্তার বিচিত্র বীজশস্য সঞ্চিত রয়েছে এখানে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতির নিরিখে ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থে। তবে সব প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে তার রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবধারাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক শিশিরকুমার দাশের মতে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের সামগ্রিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। কালের বিবর্তন ভারতবর্ষ ও বিশ্বের জনজীবনে যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার সংবেদনশীল মানসিকতায়, ধীশক্তিতে এখানে সেটি প্রত্যক্ষ করেছেন, শানিয়ে নিয়েছেন আপন চিন্তালোক। এই গ্রন্থে মোট ২৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলো– কালান্তর, বিবেচনা ও অবিবেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মূল, ছোটো ও বড়ো, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্যা, সমাধান, শূদ্রধর্ম, বৃহত্তর ভারত, হিন্দু-মুসলমান, নারী, কর্মযজ্ঞ, স্বাধিকারপ্রমত্ত, চরকা, স্বরাজসাধন, রায়তের কথা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', হিজলি ও চট্টগ্রাম, নবযুগ, প্রচলিত দণ্ডনীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভ্যতার সংকট

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে নিজের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ রচনা করেন, তার নাম দিয়েছিলেন সভ্যতার সংকট। জন্মোৎসবে সেটি পাঠ করে শোনান ক্ষিতিমোহন সেন। মানব জাতির ইতিহাসে এই সভ্যতার সংকটে তিনি স্বভাবতই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ। এই প্রবন্ধ যখন লিখছেন তখন শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যে ইউরোপ এর জ্ঞান বিজ্ঞান একদিন সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নখদন্ত বের করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সরাসরি এ বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও, ভারতবর্ষের উপরে যে এই সাম্রাজ্যবাদী লালসার ছায়া সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পড়েছে তা যুগস্রষ্টা কবির পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ভারতবর্ষ ইংরেজদের দ্বারা পদানত। অথচ ইংরেজরা এই অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী পরিচয়টুকুই সব ছিল না। এই প্রবন্ধে তিনি আরো দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মুসলমান-অমুসলমানে কোনো বিরোধ ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি দেখার জন্য অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন এবং অবস্থান করেছেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো হলো-

- ✓ **দক্ষিণডিহি:** রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর জন্ম খুলনার দক্ষিণডিহি গ্রামে। এছাড়া তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও এই গ্রামের মেয়ে।
- ✓ **শিলাইদহ:** শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় একটি সময় অতিবাহিত করেছেন। শিলাইদহ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার একটি গ্রাম। ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসেন। এখানের কুঠিবাড়িতে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি রচনা করেন।
- ✓ **শাহজাদপুর:** সিরাজগঞ্জ জেলার একটি থানা হলো শাহজাদপুর। ১৮৯০ সালে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে তিনি শাহজাদপুরে আসেন।
- ✓ **পতিসর:** নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার একটি গ্রামের নাম পতিসর। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার পতিসরে আসেন ১৮৯১ সালে। শেষবার পতিসর পরিদর্শন করেন ১৯৩৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কবি লেখক:

✓ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:** তিনি ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

✓ **স্বর্ণকুমারী দেবী:** একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার ও সমাজ সংস্কারক। তিনিই ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক।

✓ **প্রমথ চৌধুরী:** বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি জামাতা।

✓ **ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী:** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সঙ্গীতশিল্পী, লেখক ও অনুবাদক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বি.এ পাশ করেন। ইন্দিরা দেবী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক।

এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মীর মশাররফ হোসেন

- **জন্ম** : ১৮৪৭ সালের ৩ নভেম্বর, কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়।
- **উপাধি** : প্রথম মুসলিম উপন্যাস রচয়িতা, প্রথম বাঙ্গালি মুসলিম নাট্যকার।
- **পেশা** : কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকার" সাংবাদিক।
- **স্ত্রী** : প্রথম স্ত্রী: আজীজুননেহার, দ্বিতীয় স্ত্রী: বিবি কুলসুম।
- **পত্রিকা** : আজীজুননেহার (১৮৭৪), হিতকরী (১৮৯০), হুগলী বোধোদয়।
- **ছদ্মনাম** : গাজী মিঁয়া, উদাসীন পথিক।
- **আত্মজীবনী** : বিবি কুলসুম, আমার জীবনী।

মীর মশাররফ হোসেন

উপন্যাস	
রত্নবতী	কৌতুকাবহ উপন্যাস (১৮৬৯)
বিষাদ সিন্ধু	তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি গদ্য মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস
উদাসীন পথিকের মনের কথা	আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গাজী মিয়াঁর বস্তানী	আত্মজৈবনিক উপন্যাস
এসলামের জয়	
তাহমিনা	
বাঁধা খাতা	
নিয়তি কি অবনতি	
রাজিয়া খাতুন	

মীর মশাররফ হোসেন

নাটক	
বসন্তকুমারী	এটি মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক। চরিত্র – বীরেন্দ্র সিংহ, রেবতী, নরেন্দ্র সিংহ।
জমিদার দর্পণ	শ্রেষ্ঠ নাটক, চরিত্র আবু মোল্লা, নুরুন্নেহার
বেহুলা গীতাভিনয়	
টালাভিনয়	
প্রহসন	এর উপায় কী; ফাঁস কাগজ; ভাই ভাই এইতো চাই; বাঁধা খাতা প্রভৃতি
কাব্য	গোরাই-ব্রিজ; পঞ্চনারী; মোসলেম বীরত্ব; সঙ্গীত লহরী প্রভৃতি

মীর মশাররফ হোসেন

❖ **বিষাদ সিন্ধুঃ** বাংলা সাহিত্যের একমাত্র গদ্য মহাকাব্য বলা হয় বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসকে। উপন্যাসটি তিন পর্বে রচিত। পর্বগুলো হল মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদ বধ পর্ব। প্রথম পর্বে মুয়াবিয়া পুত্র এজিদের প্রেমলাভে ব্যর্থতা ও পরিণতির কাহিনি। কারবালার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে প্রথম পর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে বিপন্ন হোসেন পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা ও দুর্জয় বীর হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণ। তৃতীয় পর্ব রচিত হয়েছে এজিদ হত্যাচেষ্টা, দৈব নির্দেশে হানিফার বন্দীত্ব লাভ ও জয়নালের রাজ্য লাভের কাহিনি। সর্বোপরি কারবালার বিষাদময় ঘটনা এই উপন্যাসের উপজীব্য। এমন কারুকার্যময় ভাষার নজীর বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই উপন্যাসে এতটাই মর্মস্পর্শীভাবে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমানদের একটা বড় অংশ এই উপন্যাসের সব ঘটনাকেই সত্যি মনে করে অথচ বিষাদ সিন্ধু কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস অর্থাৎ সাহিত্য।

❖ **গাজী মিয়াঁর বস্তানীঃ** গাজী মিয়াঁর বস্তানী ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। গাজী মিয়া লেখকের ছদ্মনাম। গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। এতে গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয় বস্তানী প্রাপ্তির বিবরণ, অপর হস্তে অর্পণের কারণ, ফলশ্রুতি ও পরিমাণ এবং গাজী মিয়াঁর বিদায় বর্ণিত হয়েছে। এতে তৎকালীন কলুষিত সমাজের চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

- **জন্ম** : ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহর এলাকায়।
- **পরিচিতি** : তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য কথাশিল্পী। বাংলা উপন্যাসে তিনি প্রথম চেতনা প্রবাহরীতির প্রকাশ ঘটান।
- **মৃত্যু** : ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর, ফ্রান্সের প্যারিসের পরলোকগমন করেন। গভীর রাতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

উপন্যাস	গল্পগ্রন্থ	নাটক
▪ লালসালু ▪ চাঁদের অমাবস্যা ▪ কাঁদো নদী কাঁদো ▪ The Ugly Asian	▪ নয়নচারা ▪ দুইতীর ও অন্যান্য গল্প (এ জন্য আদমজী পুরস্কার পান)	▪ সুড়ঙ্গ ▪ বহিপীর ▪ তরঙ্গভঙ্গ ▪ উজানে মৃত্যু

➲ **যা জানা প্রয়োজন-**

- ‘লালসালু’ এর ইংরেজি অনুবাদ Tree without roots (১৯৬৭)। এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র-মজিদ, জমিলা (প্রতিবাদী প্রতীক)
- ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ একটি মনোঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাস। এ উপন্যাসে বাকাল নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র- মুস্তফা, খোদেজা।
- ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসটি নিরীক্ষাধর্মী মনোঃসমীক্ষণমূলক। এটি ফ্রান্সের একটি গ্রামে লেখা হয়। প্রধান চরিত্র- আরেফ আলী (স্কুল মাস্টার), কাদের।
- ‘বহিপীর’ তার শ্রেষ্ঠ নাটক। এ নাটকে ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি পীরের নারী লালসা ও সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।
- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা নাটক ‘তরঙ্গভঙ্গ’।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

❖ **লালসালুঃ** ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। এতে বাংলাদেশে লোক ঠকিয়ে ধর্ম ব্যবসার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মজিদ নামে নোয়াখালী অঞ্চলের এক লোক হঠাৎ একদিন মহব্বত নগরে অবির্ভূত হয়। গ্রামে ঝোপঝাড়ের মাঝে একটি পুরাতন কবরকে সে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে বর্ণনা করে। সেই সাথে পীর কর্তৃক সে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাজারের সংস্কার করার জন্য এসেছে বলে ও জানায়। তৎক্ষনাৎ মাজার সংস্কার করে সেখানে লালসালু বিছিয়ে দেওয়া হয়। আগর বাতি, মোমবাতি জ্বলতে থাকে রাতদিন। মজিদ হয়ে যায় মাজারের খাদেম। মাজারের দান, মানত ইত্যাদি আত্মসাৎ করে ফুলে ফেপে ওঠে মজিদ। ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি এই উপন্যাস অস্তিত্ববাদ বা (Existentialism) এর অনন্য উদাহরণ। অন্যান্য চরিত্র- আক্কাস, খালেক ব্যাপারী, হাসুনির মা, জমিলা, রহিমা প্রমুখ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

❑ কী কী ধরনের বই নিয়ে সমালোচনা লিখতে দিতে পারে:

- মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাস/কাব্যগ্রন্থ/স্মৃতিকাহিনি/নাটক
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস/নাটক/প্রবন্ধগ্রন্থ
- বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক/লোকসাহিত্যনির্ভর কোনো গ্রন্থ
- আঞ্চলিক উপন্যাস/রূপক-সাংকেতিক নাটক/আত্মজীবনী ইত্যাদি
- বহুল পরিচিত সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ; যেমন: 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', 'আমার দেখা নয়াচীন' ইত্যাদি।

গ্রন্থ-সমালোচনা

পরীক্ষায় উত্তর করার ক্ষেত্রে সময়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। মোটামুটি ১৫ থেকে ১৮ মিনিটের মধ্যে গ্রন্থ-সমালোচনা লেখা শেষ করতে হবে। পুরো উত্তরকে কয়েকটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে নেবেন। প্রথমে একটি শিরোনাম এবং সারসংক্ষেপ দিয়ে শুরু করবেন। যেমন:

'একাত্তরের দিনগুলি': হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

গ্রন্থের নাম: 'একাত্তরের দিনগুলি'
লেখক: জাহানারা ইমাম
প্রকাশকাল:
প্রকাশনী:
প্রচ্ছদশিল্পী:
পৃষ্ঠাসংখ্যা:

শিরোনামের নিচে গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম লিখবেন। প্রথম প্রকাশকাল জানা থাকলে লিখবেন। তবে প্রচ্ছদশিল্পী, প্রকাশনী ও পৃষ্ঠাসংখ্যা না লিখলেও হবে।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

" একাত্তরের দিনগুলি; হৃদয় রক্তক্ষরণ"

গ্রন্থের নাম: এক

লেখক: জাহানারা ইমাম

প্রথম চাল:

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

■ একাত্তরের দিনগুলি : হৃদয় রক্তক্ষরণ"

গ্রন্থের নাম: একাত্তরের দিনগুলি

লেখকের নাম : জাহানারা ইমাম

প্রকাশকাল :

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

।। অসমাপ্ত আত্মজীবনী : বাঙালির হারানো দর্পণ

গ্রন্থের নাম:

লেখকের নাম: শেখ মুজিবুর রহমান

প্রকাশকাল : ২০১২

গ্রন্থ-সমালোচনা

১ম অনুচ্ছেদ: এ অংশে ১-২ বাক্যে গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয় নিয়ে লিখবেন। যেমন: 'একাত্তরের দিনগুলি' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ। এটি দিনলিপির আকারে লেখা।

২য় অনুচ্ছেদ: এ অংশে লেখক সম্পর্কে লিখবেন। তাঁর অন্য কোনো বইয়ের নাম জানা থাকলে লিখবেন। লেখকের জন্ম-মৃত্যু সাল জানা না থাকলে অন্তত সময়কাল সম্পর্কে লিখবেন। লেখকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে লিখবেন। এককথায়, লেখক সম্পর্কে লিখবেন কমবেশি ৩ বাক্যে। যেমন: জাহানারা ইমামের বিশেষ খ্যাতি 'একাত্তরের দিনগুলি'র জন্য। তিনি শহিদজননী হিসেবে খ্যাত। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন ছিলেন সোচ্চার।

৩য় অনুচ্ছেদ: এ অংশে গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থ রচনার কারণ বা উদ্দেশ্য, গ্রন্থের বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে লিখতে হবে। যেমন: দিনলিপি জাতীয় গ্রন্থে লেখক দিনের বিবরণ দিয়ে থাকেন। 'একাত্তরের দিনগুলি' গ্রন্থে লেখক একাত্তরের শ্বাসরুদ্ধকর সময়কে তুলে এনেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার অনিবার্য পরিণতি ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে উত্তাল হতে থাকে পূর্ব বাংলা। জাহানারা ইমাম তারিখ দিয়ে সেসব দিনের কাহিনি ও তথ্য তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধে দেশের পরিস্থিতি, মানুষের ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি। এভাবে ৪-৫ বাক্য লিখতে হবে।

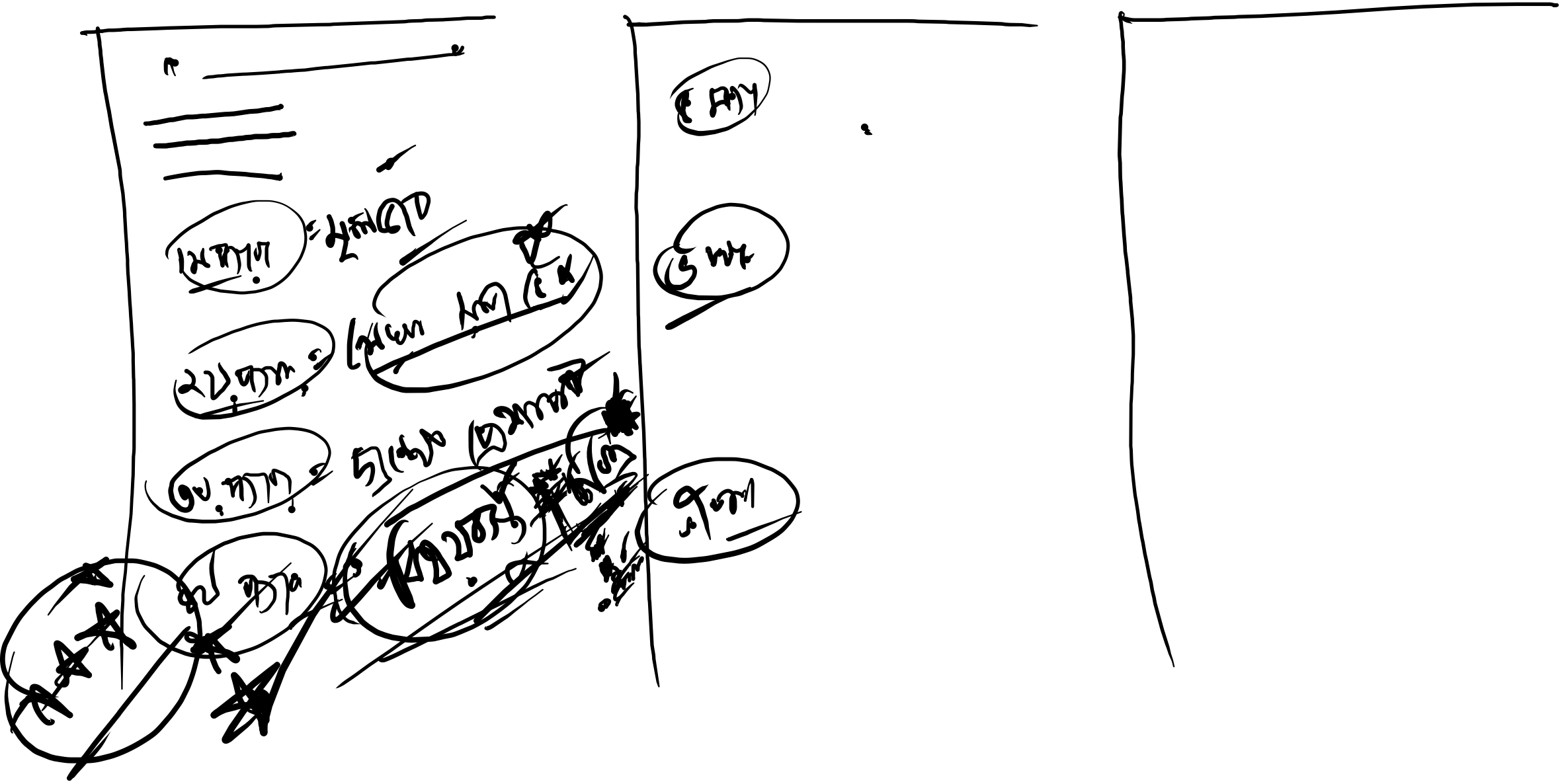

গ্রন্থ-সমালোচনা

৩য় অনুচ্ছেদ: গ্রন্থের কাহিনি, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে লিখতে হবে। এ অংশের সফলতা নির্ভর করে গ্রন্থ-পাঠের ওপর। অনেক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েও এ অংশ ভালো লেখা যায়। একটি গ্রন্থ সম্পর্কে যত তথ্য জানা যায়, তত সুন্দর করে এই অনুচ্ছেদ লেখা যায়। এ অংশের নির্দিষ্ট আয়তন নেই। যেমন: 'একাত্তরের দিনগুলি' সরাসরি পড়া থাকলে লেখা সহজ হয় এখানকার রুমী চরিত্রটি কেমন, তার কী ভূমিকা, গ্রন্থে আর কোন কোন চরিত্র আছে। গ্রন্থের কাহিনি, বিষয়, সংলাপ এগুলোও আলোচনায় আসবে।

৫ম অনুচ্ছেদ: সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় মানুষের জীবন, অনেক সময় লেখক সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মতবাদের প্রয়োগ ঘটান। এর বাইরেও আরও অনেক রকম লক্ষ্য বা আঙ্গিক-বৈচিত্র্য থাকে। এর সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থকে সংশ্লিষ্ট করা গেলে করতে হবে। যেমন: মার্ক্সবাদ, প্রেমম-লক, কল্পকাহিনি, আঞ্চলিক কাহিনি, আত্মজীবনী ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ: এ অংশে তুলনার কাজটি করতে হবে। যেমন: অনুরূপ বিষয় নিয়ে আর কোন কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, এর কিছু নমুনা দিতে হবে। একই গ্রন্থের কিংবা অন্য কোনো গ্রন্থের কোনো চরিত্রের সঙ্গে মেলানো যায় কি না, দেখতে হবে। আয়তন হতে পারে কমবেশি ৩ লাইন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

৭ম অনুচ্ছেদ: গ্রন্থের নামকরণের কারণ, বিষয় উপস্থাপনে বা চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের সফলতা-ব্যর্থতা বা কৌশল কিংবা অন্য যেকোনো ভালো-মন্দ দিকের মূল্যায়ন হবে এ অংশে।

৮ম অনুচ্ছেদ: সবশেষে কয়েকটি বাক্যে উল্লেখ করবেন গ্রন্থটির গুরুত্ব কোথায়।

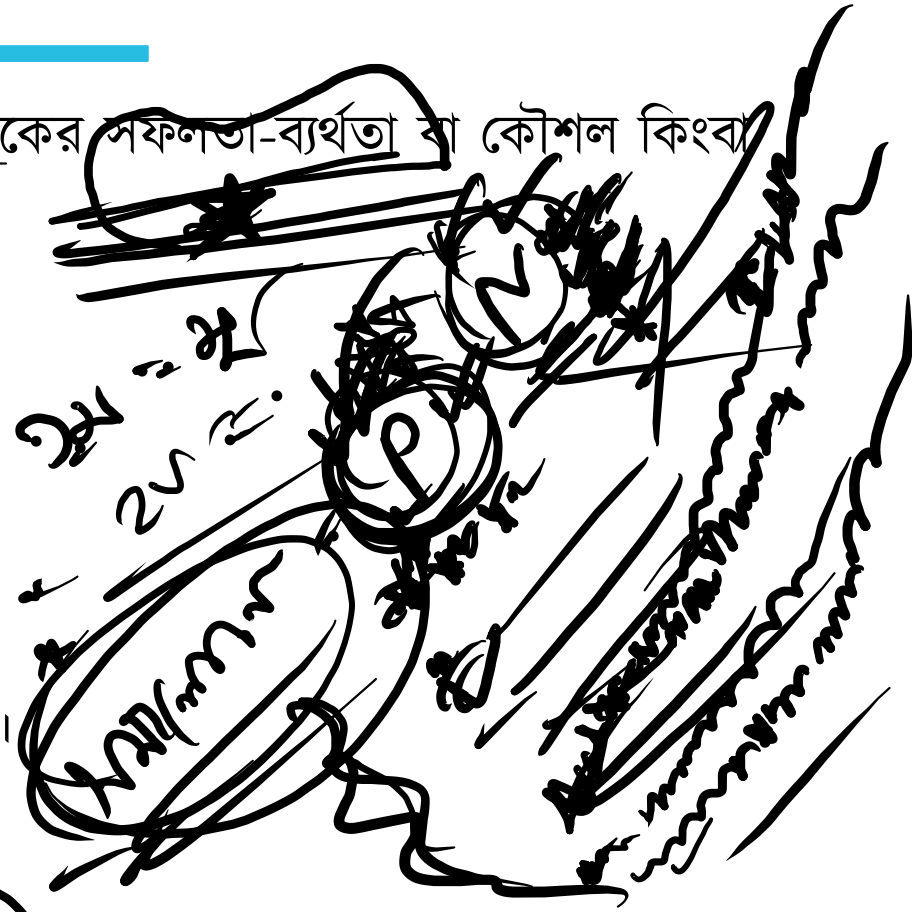

সতর্কতা:

১. গ্রন্থের নামে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করবেন।
২. একটি আকর্ষণীয় ও কাব্যিক শিরোনাম দেবেন।
৩. প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সম্পর্কে দু-চারটি তথ্য আগে থেকে জেনে রাখার চেষ্টা করুন।
৪. সময়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন।

রেফারেন্স: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তারিক মনজুর এর লেখা, প্রথম আলো হতে সংগৃহীত।

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

গ্রন্থ-সমালোচনা

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

গ্রন্থের নাম	:	অসমাপ্ত আত্মজীবনী	ঘটনা প্রবাহ	:	১৯৩৫-৫৫ পর্যন্ত
লেখক	:	শেখ মুজিবুর রহমান	চলচ্চিত্রায়ন	:	চিরঞ্জীব মুজিব (নজরুল ইসলাম)
লেখার সময়	:	১৯৬৬-৬৯ সালে জেলে থাকার সময়।	প্রকাশকাল	:	১৮ জুন, ২০১২
ভূমিকা লেখেন	:	শেখ হাসিনা	প্রকাশক	:	ইউ পি এল
ইংরেজি অনুবাদক	:	অধ্যাপক ফকরুল আলম	পৃষ্ঠা	:	৩৩০
ইংরেজি নাম	:	The Unfinished memoirs.	মূল্য	:	২২০

শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মকথন ও আত্মস্মৃতির এক অনন্য দলিল 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে নির্ভীক, আপসহীন শেখ মুজিবের ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ।

গ্রন্থটির লেখক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) । তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার আপসহীন অবিসংবাদিত এ নেতা বাংলা সাহিত্যে রেখেছেন অসামান্য অবদান। তাঁর রচিত আরো দুটি গ্রন্থ হলো- কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা ২০০৪ সালে আকস্মিকভাবে তার কন্যা শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন, "এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে একান্ত নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন।" কিভাবে বঙ্গবন্ধুর লেখালেখির শুরু সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েই শুরু হয়েছে আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থটি। জেলে অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গমাতা বেগম মুজিবের অনুপ্রেরণায় নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া স্মরণীয় ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন তিনি। জেলে খাতা কলমও কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন বেগম মুজিব। গ্রন্থটিতে বংশ পরিচয়, জন্ম-শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন, রাজনীতিতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট, সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎকালীন অবস্থা সকলই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন শেখ মুজিব।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। লেখকের ভাষায়, **"আমার জন্ম এই টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে।"** শৈশবে ভীষণ দুরন্ত ছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু নানান শারীরিক জটিলতায় বারবার বাঁধা আসে তার শিক্ষাজীবনে। কিন্তু থেমে থাকেননি তিনি। ১৯৩৮ সালের এক জনসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে সাক্ষাত হয় শেখ মুজিবের। তাদের সান্নিধ্যে রাজনীতিতে যোগদান করেন তিনি। পিতা তাঁকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়ে যেতেন। রাজনীতিতে পুত্রের প্রতি পিতার আদেশ ছিল, "Sincerity of purpose and honesty of purpose." টগবগে তরুণ মুজিবের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, মিছিলে যোগদান, জেলে যাওয়া এবং বাংলা ভাষার দাবিতে আমরণ অনশনের এক জ্বালাময়ী ইতিহাস ফুটে উঠেছে তাঁর আপন বাক্যে। দুর্ভিক্ষ, বিহার দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড, যুক্তফ্রন্ট গঠন, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উত্থান পতন, কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অপশাসন, লাহোর প্রস্তাব, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীর অধিকাংশ অধ্যায় জুড়েই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে শহীদ সাহেবের প্রভাব যে কতটা স্পষ্ট তা গ্রন্থটিতে স্পষ্ট। তবে ন্যায়-অন্যায় ও জাতীয় ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বিরোধিতা করতেও দেখা গেছে। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনের সাথে আপসের প্রশ্নে শহীদ সাহেবের নমনীয় অবস্থান দেখে বলেছিলেন- "আপস করার কোন অধিকার আপনার নেই। আমরা খাজাদের সাথে আপস করব না।" এছাড়া বাবা-মা স্ত্রী-সংসারের প্রতি সার্বক্ষণিক অনুরাগ ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। বেগম মুজিবের উদারতা এবং সর্বাত্মকভাবে স্বামীকে সহযোগীতার জন্য লেখক তাঁর লেখনিতে বারংবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। জেল জীবনের একাকিত্ব, অসহায়ত্ব, মতপার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সুনিপুণ বর্ণনা এবং গঠনগত বিশ্লেষণ বইটির প্রতিটি পাতায় অলংকৃত হয়েছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তাঁর ইসলাম প্রিয়তা সম্পর্কে বেশ তথ্য পাওয়া যায়। ভাসানীর সাথে এক জেলে থাকার বর্ণনায় তিনি বলেন– "মাওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামাজ পড়তাম। মাওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কোরআন মজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল।" কবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। লাহোরে থাকা অবস্থায় একবার তার বাড়িতে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা শুধু একজন কবি ছিলেন না, একজন দার্শনিকও ছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করলাম।" স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু মাওলানা আকরাম খাঁ এর 'আজাদ', আবুল হিশামের 'মিল্লাত', আবুল মনসুর আহমদের 'ইত্তেহাদ', ভাসানীর উদ্যোগে মানিক মিয়ার 'ইত্তেফাক' প্রভৃতি পত্রিকার অবস্থান জোরালোভাবে চিত্রিত করেছেন।

একজন মহামানবের জীবনের প্রতিটি কাহিনি, প্রতিটি গল্পই মূল্যবান। সেই তুলনায় বইটিতে জাতির জনকের জীবনের একটি অংশের বর্ণনা আমরা পাই। আর লেখা শুরু করলেও লেখক এটি শেষ করে যেতে পারেননি। তাই এর নামকরণ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" যথাযথভাবেই সার্থকতা পেয়েছে। রাজনীতির কবি হিসেবে খ্যাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের ভাষার মতোই বইটির ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু শব্দ আর বাক্য ব্যবহারে পাণ্ডিত্য কিংবা উপমা, রূপকের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা করেননি, জ্ঞানগর্ভমূলক বা কোন উপদেশ বাণী দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। তবুও গ্রন্থটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়তে হয়। অত্যন্ত সহজ ও নির্লিপ্ত ভাষায় পুরো ঘটনা প্রবাহ তিনি লিখে গেছেন। কিছু জায়গায় ঘটনার প্রয়োজনে কিছু আবেগতাড়িত কথাবার্তা লিখেছেন। পরিশেষে একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে বলা যায়। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সবই সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের বিচারে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কে তুলনা করা যায় এপিজে আবুল কালাম আজাদের 'Wings of Fire' এর সাথে। কাহিনি বিচার বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায় যে এটি কেবল আত্মজীবনীই নয় বরং রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসেবেও এটি অমূল্য।

সর্বোপরি বলতে হয়, শেখ মুজিব জীবনে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার সবই সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায়,

"বাঙালিকে জানতে হলে
শেখ মুজিবকে জানতে হবে।"

আর শেখ মুজিবকে জানতে হলে, তাঁর লেখা অসামান্য সাহিত্য কর্ম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়তে হবে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আরেক ফাল্গুন

গ্রন্থের নাম	:	আরেক ফাল্গুন	প্রকাশকাল	:	১৯৬৯
লেখক	:	জহির রায়হান	প্রকাশক	:	অনুপম প্রকাশনী
বিষয়	:	ভাষা আন্দোলন	পৃষ্ঠা	:	৭২
ঘটনা প্রবাহ	:	তিন দিন ও দুই রাত	মূল্য	:	১২০ টাকা
চরিত্র	:	নায়ক মুনিম, আসাদ, সালমা			

'আরেক ফাল্গুন' ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস যা ১৯৫৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে রচিত। এর কাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে ভাষা আন্দোলনের বহুবিধ ঘটনার বর্ণনা এবং তার সাথে জড়িত অন্যান্য প্রসঙ্গ।

উপন্যাসটির রচয়িতা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র 'জহির রায়হান (১৯৩৩ – ১৯৭২)। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক। এছাড়াও তিনি একজন ভাষা সংগ্রামী এবং মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল এই লেখক শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো-- শেষ বিকেলের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফগলা নদী, তৃষ্ণা, আর কতদিন, কয়েকটি মৃত্যু, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি পরিচালনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি হলো- কখনো আসেনি, কাঁচের দেয়াল, সঙ্গম, বেহুলা, আনোয়ারা, জীবন থেকে নেওয়া, লেট দেয়ার বি লাইট, স্টপ জেনোসাইড, এ স্টেট ইজ বর্ন ইত্যাদি।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৬৯ হলেও এটিতে ১৯৫৫ সালের ঘটনাবলির বর্ণনা আছে। উপন্যাসের ঘটনাধারার মূল স্রোত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জীবনে যে আন্দোলনের ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তা উপস্থাপন করে।

এ উপন্যাসের স্থিতিকাল অতি অল্প, মাত্র তিন দিন দুই রাতের ঘটনাবলি নিয়ে এ উপন্যাস নির্মিত। তবে বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়ে অতীতের ঘটনাধারা আসার কারণে এর ভেতরে দীর্ঘকালীন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। অতীতের বৃটিশ মেরিনের সেপাহীর ছাউনি ফেলার কাহিনির বর্ণনা উপস্থাপনের মাধ্যমে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। প্রথম দুই-দিন ও দুই রাত চলেছে একুশ পালনের বিরামহীন প্রস্তুতি। তৃতীয় দিনে কাহিনির চূড়ান্তকালে ছাত্রদের মিছিল এবং পুলিশের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। দিনের শেষে জেলগেটের ঘটনার ভিতর দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে। একশ বছর আগের ১৮৫৭ সালের কাহিনির অবতারণার ভেতর দিয়ে উপন্যাসে প্রবেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। বৃটিশ মেরিনো সেপাহীর নির্মমতার সাথে সম্পৃক্ত করে লেখক ভিক্টোরিয়া পার্কের সংযোগ স্থাপন করে মূল উপন্যাস শুরু করেন। এ পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুনিম। মুনিমের বর্ণনার ভেতরে এসেছে প্রতিবাদের প্রথম প্রতিফলন। মুনিমের পায়ে জুতো ছিলো না, খালি পায়ে সে নবাবপুরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। তার বেশভুষাতে আভিজাত্য থাকলেও সে জুতোহীন কারণ তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে ভাষার দাবিতে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভাষা আন্দোলনের নানা স্মৃতি ইতিহাসের মতো করে এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। হাইকোর্টের মোড়ে তিন বছর আগে গুলি খেয়ে মারা যাওয়া ছেলেটির কথা, বরকতের মৃত্যুর প্রসঙ্গ, বুড়ো ইমামের মোনাজাতের কথা, পাকিস্তানিদের অত্যাচারের বর্ণনা এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষভাবে আছে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর কর্ম-তৎপরতার বর্ণনা। ভাষা আন্দোলনের সময়ে প্রথম শহীদ মিনার কীভাবে গড়ে উঠেছিল তারও নানা বিবরণ রয়েছে আরেক ফাল্গুনে।

মুনিমের বর্ণনার সূত্র ধরে এসেছে আসাদের বর্ণনা। আসাদের পায়েও জুতো নেই। নগ্ন পায়ে সেও এগিয়ে যায় মুনিমের সাথে। এই আসাদই উপন্যাসের শেষ অংশে গিয়ে অনেক বেশি সক্রিয় চরিত্রে রূপান্তিত হয়। আসাদ মুনিমের সাথে সাথে লেখক এ উপন্যাসে আরও অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সালমা, রানু, নীলা, বেনু, কবি রসুল, রাহাত, সাহানা, ডলি প্রভৃতি। ছোট আয়তন বিশিষ্ট এ উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা বেশি হলেও কোনো চরিত্রই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উপস্থাপিত হয়নি। প্রতিটি চরিত্র যার যার দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে পালন করেছে। সব চরিত্রের যথাযথ অবদান উপন্যাসটির আবেদন বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

জহির রায়হান নিজে একুশে ফেব্রুয়ারির সাথে যুক্ত থাকার কারণে একুশের চেতনাকে তিনি গভীরভাবে ধারণ করেছিলেন অন্তরে। এই আবেগ-মিশ্রিত অনুভূতিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে চিত্রিত করেছেন এ 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে। ১৯৫২ সালের শহীদদের স্মরণে তারা নানা রকম কর্মসূচী পালন করে। সরকার ছাত্রদের শহীদ দিবস পালন করতে দিতে নারাজ। এর জন্য সরকার রাস্তায় স্লোগান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু ছাত্ররা দৃঢ়চিত্ত যে তারা যেকোনো মূল্যে শহীদ দিবস পালন করবে। সে উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে আসছে। তাদের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত- তিন দিন খালি পায়ে হাঁটা, রোজা রাখা, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন, স্লোগান দেয়া প্রভৃতি। শিক্ষার্থীদের শহীদ দিবস পালনের এ ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য মুনিম, আসাদ রাত-দিন কঠোর পরিশ্রম করে যায়। তাদের সাথে সাথে অন্যান্য প্রতিবাদী চরিত্র কবি রসুল, রাহাত, নীলা, সালমা, সাহানা প্রমুখ চরিত্রও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। রাজপথে আন্দোলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ আর হল থেকে ছেলেরা এসে বেলা নটা-দশটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমা হয়। পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করে জেলগেটের সামনে জড়ো করেন। এদের সংখ্যা এতো বেশি যে, তাদের নাম ডাকতে ডাকতে ডেপুটি জেলার সাহেব হাঁপিয়ে ওঠেন। তখন একজন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে-"এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো"। উপন্যাসটিতে দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগী, সংগ্রামী ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি সুবিধাভোগী-স্বার্থপর শ্রেণির বর্ণনাও ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন সরকারি গোয়েন্দা মাহমুদ ও বজলের ভেতর দিয়ে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ধারক উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' বিষয়ের বিবেচনায় যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি এর ভাষার আঙ্গিকে উপন্যাসটি বিস্ময়কর রচনাশৈলীর দাবিদার। তাছাড়া সাবলীল ভাষার ব্যবহার উপন্যাসটিকে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একাধিক উপন্যাস রচিত হলেও এর গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। রচনার উৎকর্ষে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এর অনাড়ম্বর- জড়তাহীন বাক্যনির্মাণ পাঠককে আকর্ষণ করে উপন্যাস পাঠের জন্য। ঔপন্যাসিক উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প প্রয়োগেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জহির রায়হান ছিলেন রোমান্টিক চেতনার ধারক। তাই নানা আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি কয়েকটি প্রণয়কাহিনির ধারাও তিনি রচনা করেছেন। এসব প্রেমের কাহিনির উপস্থাপনার ফলে পাঠকের কাছে উপন্যাসটি অধিক আকর্ষণীয় হয়েছে। ডলি-মুনিমের প্রেমের ধারাটি উপন্যাসে সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে। মুনিমের প্রেমিকা হলেও সে মুনিমের আদর্শকে ধারণ করতে পারেনি, তাই সে মুনিমের রাজনৈতিক প্রতিবাদী চেতনাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। ডলি মুনিমকে ত্যাগ করে বজলের প্রেমিকা হওয়ার পথে যাত্রা করে, যদিও এক সময় ডলি নিজের ভুল বুঝতে পেরে মুনিমের চেতনাকে গ্রহণ করে উপন্যাসের শেষ অংশে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা বাঙালি জাতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধের জাগরণ সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তারই প্রকাশ এই উপন্যাস। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কারণে বাংলা সাহিত্যের জগতে ভাষা আন্দোলনের দলিল স্বরূপ 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy